ভারত-জিজ্ঞাসা

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩।এ, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯

প্রকাশক—শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩.এ, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, কলিকাতা ২৯

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

'ভারত-জিজ্ঞাসা' কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিবন্ধের সমষ্টি হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে। গ্রন্থের নামকরণে সেই ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

নবযুগের স্রষ্টা রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু প্রতিভাবান ও মনস্বী সন্তান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভারত-আবিষ্কারের প্রয়াস পাইযাছেন। কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি এমন বিচিত্র ও নানা ধারায় প্রসারিত এবং ইহার নব নব রূপান্তরের ইতিহাস এমনই বিপুল যে, যাঁহারা বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল তাঁহাদের পক্ষেও এ বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি লাভ করা অসম্ভব। আমি জিজ্ঞাসু মাত্র, ভারতের অন্তরাত্মার সন্ধান দিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে, যাঁহারা জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু তাঁহারা একদিন সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেই কিন্তু সকলের মূলে রহিয়াছে সেই শ্রদ্ধা, যে শ্রদ্ধা একদিন বালক নচিকেতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। শ্রদ্ধার অর্থ কিন্তু বিচার-মূঢ়তা নয়, শ্রদ্ধার অর্থ স্থির, অবিচল, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। একথা জানি যে, আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বর্জ্জন করিযা নয়, আমাদের সনাতন আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই, অর্থাৎ আমাদিগকে যুগপৎ রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল হইতে হইবে। তাই নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে শাশ্বত ভারতকে যেমনটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা বলিয়াছি, নানা মনীষী নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ভারত-আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রামমোহনের মতে ভারতের মর্ম্মবাণীর সন্ধান করিতে হইবে প্রধানত শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদে, তবে উপনিষদের সহিত অবিরোধে পুরাণতন্ত্রাদিকেও গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহাভারত-কার বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে যে সর্ব্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই ভারতের আদর্শ। এই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের সাধনা নবজন্ম-লাভেরই সাধনা। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্ব আর এই অনুশীলনের দ্বারাই মানুষ কর্ম্ম, জ্ঞান ও

ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধিই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য। লোকমান্য তিলকের মতে ভারতীয় আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় গীতার কর্ম্মযোগে আর মহাত্মা গান্ধীর মতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভারতীয় ধর্ম্ম ও চরিত্র-নীতির সার কথা। ভারত-আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় এই যে দৃষ্টি-ভঙ্গির বিভিন্নতা, ইহার মূলে রহিয়াছে এই সকল মনস্বী পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচি-প্রবৃত্তির পার্থক্য।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি ও বিশাল-বুদ্ধি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অখণ্ড ভারতের কবি, ভারতীয় সভ্যতার পূরিপূর্ণ রূপটি তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদের এই দুই অমর মহাকাব্যে গৃহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই বিবৃত হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণেব সূক্তে যে বলিষ্ঠ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে, মহাকাব্যের যুগেও সে দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় নাই; বিশেষত, মহাভারতকার যে সমন্বয়ের বা সামঞ্জস্যের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ বলা যাইতে পারে। মহাভারতকার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মধ্যে, যোগ ও ভোগের মধ্যে, ঐহিক সুখ ও পারত্রিক কল্যাণের মধ্যে কোন আত্যন্তিক বিরোধের কল্পনা করেন নাই। মহামতি চরকও বলিয়াছেন—প্রত্যেক মানুষেরই যুগপৎ তিনটি বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া দরকার,—সুস্থ দেহে দীর্ঘ কাল বাঁচা, সাধু উপায়ে প্রচুর ধনোপার্জ্জন করা এবং পরলোকে মঙ্গল লাভ করা। ভারতের বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায় অবশ্য এই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শকে আশ্রয় করেন নাই, কেন না, তাঁহারা ভাগবতী তনু বা পক্ক দেহ লাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রহিয়াছে, তেমনই ঐক্যও রহিয়াছে।

জীবন ও জগৎসম্পর্কে ভারতের যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে, ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার মধ্যেও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি, ভারতে বিয়োগান্ত বা

বিষাদান্ত নাটকের রচনা কেন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আজকাল এ দেশের অনেক স্বয়ং-সিদ্ধ লেখক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কোন কোন বচনকে স্বতঃ-সিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। 'ভয় হইতে ধর্ম্ম-বোধের উৎপত্তি হইয়াছে', ইহা এইরূপ একটি সূত্র। এই শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ স্বয়ং বিভ্রান্ত হন ও অপরের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া থাকেন। তাই 'ভারত-জিজ্ঞাসার' কয়েকটি প্রবন্ধে আমি ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

ভারতের অভ্যন্তরে যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভগবদ্গীতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অবশ্য, গীতারও বহুবিধ সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হইয়াছে। তথাপি, সম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্য-স্থাপন যদি আমাদের লক্ষ্য না হয়, তবে হয়তো লোকমান্য তিলকের সঙ্গে আমরাও বলিতে পারি, আমাদের জীবনের আদর্শ কর্ম্মযোগ। আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে লোকসংগ্রহের জন্য, অর্থাৎ, সমাজের স্থিতির জন্য, আমাদিগকে প্রকৃতি-নিয়ত কর্ম্ম করিতে হইবে এবং সমুদয় কর্ম্মকে যজ্ঞে পরিণত করিতে হইবে। পথ অতি নিশিত ও দুর্গম, তথাপি আদর্শকে তো খর্ব্ব করা চলিবে না। কর্ম্মের এই কৌশল যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তবেই একদিন ঐক্য-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। আর তখনই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারায় অবগাহন করিয়া নবজন্ম লাভ করিতে পারিব।

'ভারত-জিজ্ঞাসার' নিবন্ধগুলির মধ্যে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, তাই এই দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা।

গ্রন্থের অন্তর্গত সমস্ত প্রবন্ধই আনন্দবাজার, যুগান্তর, শনিবারের চিঠি, গল্প-ভারতী, জয়শ্রী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি স্বল্প কালের ব্যবধানে রচিত। ইহাদের মধ্যে-স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে, তবে পুনরুক্তি সর্ব্বত্র দোষাবহ নাও হইতে পারে। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই—'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'। এই সূত্র অনুসারে পুনরুক্তি দোষাবহ না সমর্থনযোগ্য, তাহা বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করে।

পরিশেষে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বমৈত্রী' শীর্ষক প্রবন্ধটির সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিবার আছে। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, Convex Lens এর সংস্কৃত নাম অয়স্কান্ত (৯৪ পৃঃ, ৪র্থ পংক্তি)। কথাটা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, কারণ, সাধারণতঃ 'চুম্বক' অর্থেই 'অয়স্কান্ত' কথাটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃতেই আতস কাচের অর্থেও অয়স্কান্তের প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রমাণ যথা—

'যথার্করশ্মিসংযোগাদয়স্কান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি তূলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ'॥

সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অয়স্কান্ত অগ্নিকে প্রকাশ করে, যোগিগণ ইহা হইতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিসমূহকে একটি কেন্দ্রের অভিমুখ করার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের ১০৫-৬ পৃষ্ঠায় স্বামীজির রচনা হইতে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মূলে কিছু অনবধানতা-জনিত প্রমাদ রহিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধু উপেন্দ্রচন্দ্র সেন শাস্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই উদ্ধৃতিতে বৈশেষিক দর্শনের স্থানে ন্যায়দর্শন এবং ঋষি জৈমিনি স্থলে বাৎস্যায়ন হইবে।

ন্যায়দর্শনের সূত্রে আছে—'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ' (১।১।৭)। বাৎস্যায়ন ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—'ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্' অর্থাৎ ঋষিগণ, আর্য্যগণ ও ম্লেচ্ছগণ সম্বন্ধে আপ্তলক্ষণ সমান।

পরিশেষে বক্তব্য এই, আমার দৃষ্টিক্ষীণতা বশত হয়তো স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ লক্ষিত হইবে, সহৃদয় পাঠকগণ এ ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

২৬শে আষাঢ়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সূচীপত্র

ভারতীয় সাধনায় দেশমাতৃকা

বাংলার কোন মনস্বী লেখক বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল সর্বভূতে মৈত্রীভাবনা, নিখিল বিশ্বের হিতচিন্তা, তাই স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতি-বাৎসল্যরূপ কোন সংকীর্ণ আদর্শকে তাঁহারা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বৃহৎ আদর্শের ভিতর ক্ষুদ্র আদর্শকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এদেশের সাধকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

আমরা স্বীকার করি, আমাদের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এইরূপ অজস্র উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের তর্পণবিধিতে সর্বজীবের জন্য যে উদার কল্যাণ-কামনা রহিয়াছে, উহা আমাদিগকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। 'স্বদেশপ্রেম' বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহার আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নাই। আর্য রামায়ণের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' স্বদেশপ্রেমের আদর্শ নহে। তথাপি, এ কথা বলা চলে না যে, ভারতীয় শিক্ষাবিধিতে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তার কোন স্থান ছিল না। শুধু এইমাত্র বলা চলে, এ বিষয়ে ভারতীয় আদর্শ পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় ঋষির মতে স্বদেশপ্রেমের যথার্থ পরিচয় রহিয়াছে স্বদেশের আত্মার মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করায়, আর এই জন্যই প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। অধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে আহারদানের নাম ভূতযজ্ঞ আর অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। প্রথম দুইটি যজ্ঞের মধ্য দিয়া আমরা ঋষিগণ ও পিতৃগণের সঙ্গে চিন্তাধারার সংযোগ

রক্ষা করি এবং শেষ তিনটি যজ্ঞের মধ্য দিয়া আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ও মৈত্রীভাবনা অভ্যাস করি। ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়া আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে, আমাদের শিরায়-শিরায় প্রাক্তন সূরিগণের রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদের চিন্তা আমাদের মনের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে, সুতরাং চিরাগত ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির বাহিরে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আমাদের নাই।

ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাস পাঠ করিয়া অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ভারতে কোন দিনই একটি মহাজাতি গড়িয়া উঠে নাই; একমাত্র ধর্মাশোক বা মহামতি আকবরের সময় ভিন্ন আর কখনও অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এইরূপ ধারণাকে একেবারে মিথ্যা বলা চলে না, সংহতির অভাব যে ভারতের দুর্গতির অন্যতম কারণ, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তথাপি, এ কথাও সত্য যে নিখিল ভারতে একটি ভাবগত ঐক্য কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইংরেজ-রাজত্বের প্রাক্কালে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই বা প্রাদেশিকতার নামে কখনও জঘন্য বর্বরতার অভিনয় হয় নাই। সমগ্র ভারতের ভাবগত বা সংস্কৃতিগত অখণ্ডতা যাহাতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার জন্যই শাস্ত্রকারগণ তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। পীঠস্থানসমূহের দর্শনে সত্যই পুণ্যলাভ হয়, কারণ, ইহার মধ্য দিয়াই আমরা ভারতের অখণ্ডত্ব ও পাবনত্ব উপলব্ধি করি। যিনি বিশ্বজননী সতী, তিনি তখন আমাদের নিকট ভারত-জননী-রূপে প্রকাশিত হন। তখন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের রহস্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের গানও বিশেষ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে—

'ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের) আঁচল পাতা।'

তর্পণের মন্ত্রের মধ্য দিয়াও আমাদের মনে অখণ্ড ভারতের উপলব্ধি জাগিয়া উঠে। তীর্থ-আবাহনের মন্ত্রটি এই—

'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ'॥

আবার আর একটি মন্ত্র শুনুন—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু'॥

আমাদের দেশে একটি কথা আছে—যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। আমাদের দেহ তাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আবার 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে', (ইহা গোঁড়ামির কথা নয়, বিশেষ অর্থে কথাটি সত্য) তাই শাস্ত্রের নির্দেশ এই—নিজের দেহকে পুণ্যভূমি ভারতভূমি বলিয়া মনে করিবে, আর সর্বদা এই চিন্তা করিবে যে সকল তীর্থ এই দেহে বিরাজিত, তাই এ দেহ শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। এইরূপ ভাবনা বা ধ্যানের মধ্য দিয়াও আমরা ভারতের অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করি।

ভারতের ভাবগত ঐক্য যাহাতে রক্ষিত হয়, এইজন্য শাস্ত্রকার নির্দেশ দিয়াছেন—সকলকে ধীরে ধীরে আর্যের স্তরে উন্নীত করিবে। একদিকে আমাদের দেশে চলিয়াছে এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়া, অপর দিকে ভারতবাসী অতি সহজেই নানা জাতির সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। যেখানে সংস্কৃতি-সংঘর্ষ স্বাভাবিক ছিল, সেখানেও ভারতে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মিলনে এক বৃহত্তর সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। গীতায় যে লোক-সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ সকলকে স্বধর্মে প্রবর্তন, যাহাতে সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা যায়।

আমরা এক হিসাবে শ্রীরামচন্দ্রকে অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে পারি।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে একই সময়ে দৈবী ও আসুরী সভ্যতা প্রচলিত ছিল। অযোধ্যা ও মিথিলায় ছিল দৈবী সভ্যতা, কিষ্কিন্ধ্যা

ও লঙ্কায় ছিল আসুরী সভ্যতা। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বড় কম ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারকে উপলক্ষ্য করিয়া এই উভয় রাজ্যেই আপন অলৌকিক চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, কারণ এইভাবে ধর্ম-সংস্থাপনই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুসারে হয়তো আচার্য শঙ্করকে 'স্বদেশপ্রেমিক' বলা চলিবে না, কিন্তু যিনি একদিন অসাধারণ প্রতিভার বলে ভারতবর্ষ হইতে ধর্মের গ্লানি দূর করিয়াছিলেন এবং অনলস কর্মশক্তির বলে 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত' ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশপ্রেমের তুলনা কোথায়!

আমাদের পুরাণে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, ভারতভূমি দেবভূমি, ভারতভূমি পুণ্যভূমি। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আমরা যদি এই ভাবটিকে সর্বদা মনে জাগাইয়া রাখি, তাহা হইলে আমাদের যথার্থ কল্যাণ হয়। বিশ্ব-প্রেম অবশ্য খুব বড় কথা, কিন্তু যাঁহার মধ্যে দেশপ্রেম বা স্বাজাত্য-বোধেরই স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহার বিশ্বপ্রেম একটা কথার কথা মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আমরা যেমন বহু পুণ্যের ফলে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনই বহু সুকৃতির ফলে এই দেবভূমি ভারতভূমিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি। তাই আমরা লোকগুরু হইবার দুর্লভ অধিকার লাভ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শী মনু সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন—

'এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥'

যিনি ভারতবর্ষে জন্মিয়াছেন, এইরূপ ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট হইতে পৃথিবীর সকল মানুষ নিজ নিজ আচরণ শিক্ষা করিবে। এ যুগে বিবেকানন্দের ন্যায় লোকোত্তর পুরুষ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্ববরেণ্য কবিও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে আমরা শুধু বিদেশ হইতে গ্রহণই করিব না, আমরা বিদেশকে দান করিব আমাদের অধ্যাত্ম সম্পদ আর এই সম্পদই নিখিল জগৎকে রক্ষা করিবে মহতী বিনষ্টির হাত হইতে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমরা পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে জন্মিয়াছি, এইরূপ ভাবনা যদি যথার্থ হয়, তবেই আমরা আপন স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত না করিয়াও ভারতের আত্মার সঙ্গে যুক্ত হইতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥'

(আদিলীলা, নবম পরিচ্ছেদ)

তাই আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় সাধনায় স্বদেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধের কোন স্থান ছিল না, একথা সত্য নয়। তবে এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ঋষি ও মনীষীদের ধারণা পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের ধারণা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। প্রতীচ্যের উদগ্র স্বদেশপ্রেম বা Patriotism এবং সংকীর্ণ জাতীয়তা বা Aggressive Nationalism-এর আদর্শ অনেক স্থলেই মানবধর্মের বিরোধী, কিন্তু প্রাচীন ভারতে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাত্য-বোধ ছিল ধর্মেরই অঙ্গীভূত।

প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র

যুগে যুগে ভারতবর্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করিয়াছে, কালের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তথাপি ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রে চিরদিন যে আদর্শটি রূপায়িত হইয়াছে, উহা শাশ্বত ও ধ্রুব; —ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ, রসস্রষ্টা কবিগণ, যুগস্রষ্টা লোকোত্তর পুরুষগণ সেই আদর্শকেই প্রচার করিয়াছেন বহুভাবে; ভারত যখনই সেই আদর্শ হইতে প্রমত্ত হইয়া বিনষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারত চিরদিন তাহার সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-পরিকল্পনার মধ্যেও তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। যাহাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এ দেশের শাস্ত্রকর্তারা বিধান রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সমাজের মূল গৃহ, সুতরাং সামাজিক স্থিতি পারিবারিক স্থিতির উপর নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার,
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে,
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল।'

ভারতবর্ষে গার্হস্থ্য ধর্মের যে মহান আদর্শ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা এখানে অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এদেশে গৃহস্থের আদর্শ ভোগ নহে, সমাজের কল্যাণ, আত্মসুখ নহে, বহুজনের হিত। তাঁহাকে কল্যাণ-বুদ্ধির দ্বারাই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইত। হর-গৌরীর মিলনের মধ্যে

ভারতবাসী দেখিতে পাইয়াছে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সমন্বয়। ধনীর ধন তখন বাহ্যাড়ম্বরে ব্যয়িত হইত না, বা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হইয়া বহুলতা লাভ করিত না। তাহার ধন বহু মানবের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াই সার্থকতা লাভ করিত। ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যে অর্থ উদ্বৃত্ত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সে ধনে ধনীর কোন অধিকার নাই।

'যাবৎ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
যোঽধিকমভিমন্যেত সস্তেন দণ্ডমর্হতি ॥'

যে পরিমাণ খাদ্যে উদরপূর্তি হয়, সেই পরিমাণ খাদ্যেই দেহিগণের অধিকার; যে ইহার অধিক আত্মসাৎ করে, সে তস্কর, সুতরাং সে দণ্ডের যোগ্য।

শাস্ত্রকার অবশ্য ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য লুপ্ত করিয়া দিয়া অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই, কিন্তু ধনীর ধন যে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে, জনসাধারণেরই কল্যাণের জন্য, এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। আমেরিকান প্রভৃতি প্রতীচ্য জাতিগণ বিজ্ঞানের সহায়তায় এবং অগণিত মানুষের শ্রমের বিনিময়ে প্রচুর ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতেছেন, সেই সকল দ্রব্য তাহাদের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইতেছে কিন্তু তাহাদিগকে শান্তি দিতে পারে নাই। আমরাও যে পরিমাণে ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দিতেছি, শান্তিও সেই পরিমাণে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবশ্য, নানা কারণে আমাদের দেশ হইতে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে আমরা অনেকাংশে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা অনেকটা লাইফ-ইনসিওরেন্সের মত। কিন্তু যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ত্যাগ-প্রবৃত্তির অভাব, সেখানে একান্নবর্তী পরিবারে স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাত অনিবার্য। সেইজন্যই আমরা অনেক স্থলে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়াছি। আমরা আমাদের গৃহধর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের গৃহধর্মের আদর্শ কি? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥' (৩।৯)

বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহা ব্যতীত আর সকল কর্মই বন্ধনের হেতু হয়। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি অনাসক্ত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম কর।

এই কর্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা লোকসংগ্রহ। লোক-সংগ্রহ কি? মানুষকে পাপ বা অকল্যাণের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া পুণ্য বা কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত করা। ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—'লোকসংগ্রহের জন্যও তোমার কর্ম করা উচিত', 'যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি আসক্তিবিহীন হইয়া লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন' ইত্যাদি। আমাদের কর্মের ফল কত সুদূর-প্রসারী, তাহা আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না, কিন্তু সত্যই আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা অপরকে সৎপথে কিংবা অসৎপথে প্রবর্তিত করি। তাই গীতার নির্দেশ এই 'প্রত্যেক মানুষকে এমনভাবে কর্ম করিতে হইবে যেন অপরে তাহার অনুসরণ করিয়া 'সর্বোত্তম মঙ্গল' লাভ করিতে পারে।

মানুষ যখন কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম করে, তখনই সে সমাজের যথার্থসেবক। যেখানে কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত, সেখানে মানুষ সকল কর্মে পরস্পরের সহায় হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।' ৩।১১

পরস্পরের ভাবনার দ্বারা পরম শ্রেয়কে তোমরা লাভ করিবে। অবশ্য, পরস্পরের ভাবনা বলিতে ভগবান বুঝিয়াছেন,—দেবতাগণ ও মনুষ্যগণের পারস্পরিক কল্যাণ ভাবনা। কিন্তু ভগবানের উক্তির মধ্যে আর একটি ইঙ্গিতও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে ইঙ্গিতটি এই, সমাজে যাহারা অভিজাত বা উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাহারা জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করিবে এবং জনসাধারণও শারীরিক শ্রম প্রভৃতির দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়দিগকে রক্ষা করিবে। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষ সমাজরূপ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অতএব

দেখা যায়, শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, সমাজের 'উপরতলা ও নীচের তলার' মধ্যে যাতায়াতের পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আমাদের প্রত্যেকেরই দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ শোধ করা কর্তব্য। আমরা হোমের দ্বারা দেবঋণ, তর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা ঋষিঋণ শোধ করি। আমরা এইরূপে অনুভব করি যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণের ও ঋষিগণের চিন্তাধারা আমাদের শোণিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং আমরা প্রাণধারণের জন্য অদৃশ্য শক্তির উপরও নির্ভর করিতেছি। আবার মনুষ্যের নিকট এবং ইতর প্রাণীর নিকটও আমাদের ঋণ সামান্য নহে। এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রহিয়াছে—নৃযজ্ঞে ও ভূতযজ্ঞে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রহ্মযজ্ঞ বা শাস্ত্রাধ্যয়ন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দেবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা ইতর প্রাণীদিগকে আহার প্রদান এবং নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা।

'অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥'

আমাদের গৃহধর্মের আদর্শ অথর্ববেদে চমৎকার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্য প্রেম ও প্রভুভক্তির আদর্শ ভারতে কত সমুন্নত ছিল, রামায়ণে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণকে' গৃহধর্মের কাব্য বলিয়াছেন। ভগবান মনু গার্হস্থ্যাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন, কারণ, মাতাকে আশ্রয় করিয়া যেমন সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনই অন্য আশ্রমিকগণ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করে। গার্হস্থ্যাশ্রমে স্ত্রী ভোগের সহচরী নয়, সহধর্মিণী। গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য বিধান রহিয়াছে 'প্রজাতন্তুং ন ব্যবচ্ছেৎসীঃ', 'প্রজাতন্তু ছেদন করিবে না'; সোজা কথায়, বংশরক্ষা করিবে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঋষিগণ এরূপ বিধান দিয়াছেন। এইজন্যই আমাদের দেশে বংশ-রক্ষাও ধর্মের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি অপত্যকামনায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন, তিনি ব্রহ্মচারী ও

জিতেন্দ্রিয় হইলেন। এত বড় কথা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ কল্পনাও করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

যে যুগে গৃহস্থমাত্রেই লোককল্যাণের ব্রত গ্রহণ করিতেন, সে যুগে স্বভাবতই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত। ভারতের সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, ইহা এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছেন, 'ইউরোপে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না কিন্তু কর্মের স্বাধীনতা ছিল, ভারতে কর্মের স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা ছিল'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তাই বহু তীক্ষ্ণধী দার্শনিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

ভারতীয় সমাজ অধিকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অধিকারবাদ ভারতীয় মনীষার একটি আশ্চর্য আবিষ্কার। ভারতীয় ঋষিগণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে মানবের স্বাভাবিক পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন, গুণভেদে বৃত্তিভেদও স্বীকার করিয়াছেন। অধিকারিভেদে সাধনার ভেদের কথা তন্ত্র সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য, আমাদের সমাজে যে অধিকারবাদের অপপ্রয়োগ হয় নাই, এ কথা সত্য নহে. এ সমাজে যুগে যুগে নানাপ্রকার বিকৃতিও দেখা দিয়াছে, আবার সেই সকল গ্লানিকে দূর করিবার জন্য আচার্যগণেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতের সনাতন আদর্শ কি? সে আদর্শ এই,—প্রত্যেকটি মানুষকে প্রথমে দ্বিজত্ব ও পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইবে। জীবনে পরিপূর্ণতা লাভে বা মুক্তি লাভে যে প্রত্যেক নরনারীর অধিকার রহিয়াছে, এ কথা তো এদেশের সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত। যাঁহারা চতুরাশ্রমের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয়, ত্যাগ ও ভোগ উভয়েরই যথাযোগ্য মূল্য নির্দেশ করিয়াছেন। আবার, কালক্রমে এই আশ্রম-চতুষ্টয় যখন লুপ্ত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা দিয়াছেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হইয়াছে—'আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে', 'কলিযুগে মাত্র দুইটি আশ্রম, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস'। কিন্তু পাছে কোন অনধিকারী ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সমাজের অকল্যাণ সাধন করে,

এইজন্য শাস্ত্রে অনেক কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রের একটি নির্দেশ শুনুন—

'মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ'॥

'বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া কেহ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবে না'।

ভারতের ঋষিও মনীষিগণ যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়াছেন, তাই দেশে এত বহুসংখ্যক স্মৃতিকর্তার আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা যুগোপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেও কেহই ভারতের সনাতন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

এবার সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রের কথা বলিব।

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, বর্গতন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সচিবায়ত্ত রাজতন্ত্রই এই দেশে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। রাজার কর্তব্য ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা সমাজস্থিতির সহায়তা করা। রাজ্যরক্ষার জন্যই রাজাকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সেকালে রাজধর্মের আদর্শ কি ছিল, তাহা মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশীয় রাজারা ছিলেন রাজধর্মের আদর্শ, তাই তাঁহারা 'যথাপরাধ-দণ্ড' ছিলেন অর্থাৎ অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধান করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি সেই রঘুবংশীয় নরপতিদের কথা বলিব যাঁহারা—

'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্'॥

'ত্যাগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতেন, সত্যরক্ষার জন্য মিতভাষী হইতেন, যশোলাভের জন্য রাজ্যজয়ের ইচ্ছা করিতেন, আর সন্তানলাভের জন্য বিবাহ করিতেন'। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণসমূহ কেমন অবিরোধে বিরাজ করিত, সে কথাও মহাকবি উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। রাজর্ষি দিলীপ সম্পর্কে মহাকবি বলিয়াছেন—তিনি যুগপৎ ভীম ও কান্তগুণের অধিকারী

ছিলেন, তাই তিনি একই সঙ্গে ছিলেন অধৃষ্য ও অভিগম্য! তিনি প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ, সূর্য পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করে বটে, কিন্তু উহাই আবার সহস্রগুণে পৃথিবীকে ফিরাইয়া দেয়। আদর্শ রাজার লক্ষণ সম্পর্কে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—রাজা স্বয়ং বিদ্বান ও বিনয়ী হইবেন এবং ছয়টি আভ্যন্তরীণ রিপুকে জয় করিবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—পুরাকালে যে সমস্ত রাজা কাম. ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষের অধীন হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন আর যাঁহারা এই রিপুসমূহকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল অসপত্ন রাজ্য সম্ভোগ করিয়াছেন। (কৌটিল্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।) নীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, রাজাকে সর্বদা অনলস ও অতন্দ্রিত হইয়া যথাকালে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তিনি 'চার-চক্ষু' হইবেন অর্থাৎ চার বা গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের সকল ব্যাপার দর্শন করিবেন। আর প্রজাগণের পক্ষে তিনি হইবেন 'পিতৃতুল্য'। রঘুবংশে রাজর্ষি দিলীপ সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—

'প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ'॥

প্রজাগণকে বিনয়শিক্ষা-দান, রক্ষণ ও ভরণ করিতেন বলিয়া তিনিই তাঁহাদের যথার্থ পিতা ছিলেন, তাঁহাদের পিতৃগণ শুধু ছিলেন জন্মহেতু। অবশ্য রাজর্ষি দিলীপ এ বিষয়ে নয়-শাস্ত্রেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। আর শুধু রাজর্ষি দিলীপ কেন, স্মরণ করুন ধর্মাশোকের কথা যিনি প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণচিন্তায় সর্ব্বদা জাগরূক ছিলেন, এবং সর্বভূতের মৈত্রীভাবনায় যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দেবানাং প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকাল সত্যই ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নানা দিগ্দেশে

মানব-কল্যাণের জন্য কী বিপুল আয়োজনই না হইয়াছিল! তাই বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ও মনীষী এইচ জি. ওয়েল্‌স্‌ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অশোকের কল্যাণ-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অনুশাসন-লিপির মধ্যে যে বিশাল হৃদয়ের পরিচয় আছে, তাহা আজও আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। এই সঙ্গে স্মরণ করি সম্রাট হর্ষবর্ধনের কথা যাঁহার চরিত্র ছিল ত্যাগের মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল এবং যাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য সর্বদাই প্রজাবর্গের হর্ষ বর্ধন করিত।

যাঁহারা দণ্ডনীতির প্রণেতা, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, প্রত্যেকটি দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি যেন উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করে। কারণ, যেখানে দুর্বৃত্তের পক্ষে অর্থব্যয় করিলে বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে লোকস্থিতি ব্যাহত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাঁহারা দণ্ডনীতি বা Penal Code প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতি পদে অতি সতর্কতার সহিত আইনের ধারাগুলি রচনা করিয়াছেন যাহাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ডভোগ করিতে না হয়। তাঁহারা মনে করেন, বরং দশ জন দোষী লোক অব্যাহতি পাইবে, তথাপি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিও যেন দণ্ড ভোগ না করে। ইহার ফল সমাজের পক্ষে সর্বাংশে শুভ হয় নাই।

আজ বিত্তশালী ব্যক্তি দুষ্কর্ম করিয়াও আইনকে ফাঁকি দিতে পারে, চোরা কারবারীরা মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে সাহস পায়, সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা হীন কর্ম করিয়াও নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করে, হাঁসপাতালে রোগীদের ঔষধও কোন কোন ক্ষেত্রে অপসারিত হয় এবং 'জাল ঔষধ' গ্রহণ করিবার ফলে রোগীদের কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা লইয়াও কাহারও মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। এ যুগে 'অমৃতের পুত্রগণকে' যদি দেখিতে হয়, তাহা হইলে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মাধিকরণ' একবার ঘুরিয়া দেখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্রকার বুঝিয়াছেন, যথার্থ দণ্ডনীতির আদর্শ কি হওয়া উচিত।

'অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি'॥

যাহারা দণ্ডার্হ, রাজা যদি তাহাদিগকে দণ্ডদান না করেন, অথবা যাহারা দণ্ডের অযোগ্য, তাহাদিগকে যদি দণ্ডদান করেন, তাহা হইলে তিনি ঘোর অপযশ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে পরিণামে নরকে গমন করিতে হয়।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে রাজার ব্রত ছিল প্রজানুরঞ্জন, প্রজাবর্গের যোগক্ষেম-সাধন। প্রজার মঙ্গলেই যে রাজার মঙ্গল; এ কথা কৌটিল্যও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রজাহিতের জন্যই রাজাকে সর্বদা উত্থানপরায়ণ হইতে হইবে অর্থাৎ রাজা অনলস ভাবে সর্বদা রাজকার্য-সাধনে উদ্যোগী হইবেন। উত্থানের গুণের কথা ও অনুত্থানের দোষের কথা কৌটিল্য আলোচনা করিয়াছেন।

আজ আমরা 'সর্বোদয় সমাজ' ও 'কল্যাণরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছি, সুতরাং প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কি আদর্শ ছিল, সে কথাটি আমাদিগকে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবে। বর্তমান যুগে যে পুরাতন সমাজ বা রাষ্ট্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়, সে কথা আমরা জানি, ভারতবর্ষেও যে যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে কথা আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পশ্চাতে যে মহান, গৌরবময়, শুভ ও ধ্রুব আদর্শটি বর্তমান ছিল, সেই আদর্শটিকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের চিরন্তন আদর্শ বিসর্জন দিলে আমরা কোনদিন জগতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিব না। আমরা যে আদর্শের কথা বলিতেছি, উহা অবশ্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই গ্রহণীয়, কেন না, উহা কল্যাণের আদর্শ; সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে আমাদিগকে স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিতে হইবে, আত্মত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে, আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, আর সর্বোপরি ধর্মকে আচরণের মধ্য দিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি যদি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমরা স্বয়ং শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিব এবং অপরকেও কল্যাণের পন্থা নির্দেশ করিতে পারিব। ভগবান আমাদের সকলের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করুন।

মহর্ষি বাল্মীকি ও কবি শ্রীমধুসূদন

দেবতাত্মা হিমাদ্রি ধ্যানস্তব্ধ দেবাদিদেবের ন্যায় আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া রহিয়াছে আর তাহার জটাজাল হইতে পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা উৎসারিত হইয়া চিরদিন ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে। হিমালয় হইতে গঙ্গার ধারার মতই মহর্ষি বাল্মীকির বিশাল হৃদয় হইতে রামায়ণী কথার ধারা প্রবাহিত হইয়া নরলোককে পবিত্র করিতেছে। রামায়ণী কথা চিরদিন মানুষের তৃষ্ণা-কলুষহারিণী। পৃথিবীতে কত মহা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি যে অমর মহাকাব্যের রচয়িতা, তাহা আপন গৌরবে আজও অম্লান। বাল্মীকি সৌন্দর্যস্রষ্টা ও ক্রান্তদর্শী, তাই তিনি যথার্থ কবি, তিনি 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা' বলিয়াছেন, তাই তিনি মহাকবি, তাঁহার মহাকাব্য অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় কত কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়া রসিকজনের মনোরঞ্জন করিতেছে, শ্রীমধুসূদনের ভাষায় মহর্ষি বাল্মীকির পদচিহ্ন ধ্যান করিয়া কত কবি যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই তিনি কবিগুরু। শ্রীমধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে এই কবিগুরুর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়াছেন—

'নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

বিদ্রোহী কবি শ্রীমধুসূদন অবশ্য নানা দেশের নানা কবির কাব্যোদ্যান হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন, দেশ-বিদেশ হইতে রমণীয় কুসুমরাজি আহরণ করিয়া নূতন মাল্য গ্রথিত করিয়াছেন, কেননা, তিনি 'অপূর্ব-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বা 'নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির' অধিকারী ছিলেন আর এই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির সঙ্গে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের

ঘটিয়াছিল মণিকাঞ্চন-সংযোগ। কিন্তু মধুসূদনের গৌরব সম্পূর্ণ অম্লান রাখিয়াও আমরা এ-কথা বলিতে পারি যে, তিনি আর্ষ রামায়ণ শুধু আত্মসাৎ করেন নাই, তাঁহার অনেক অভিনব ভাব-কল্পনার বীজ তিনি এই মহাকাব্যের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের অনেকেই যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে মনে সন্দেহ জাগে, আর্ষ রামায়ণের সঙ্গে তাঁহাদের গভীর পরিচয় আছে কিনা। কেহ কেহ বাল্মীকি-রামায়ণের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া যে তুলনা করিয়াছেন, তাহাও বিভ্রান্তিকর। তাই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

মধুসূদনের কবি-কল্পনা যে কোন কোন ক্ষেত্রে রামায়ণের দুই একটি শ্লোকের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন, মধুসূদন গ্রীক নিয়তিবাদের সূত্রে তাঁহার মহাকাব্য গ্রথিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে দেখিতে পাই, রাবণ সমুদ্রে সেতু-বন্ধনের মধ্যে নিয়তির অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছেন। সাগরকে সম্বোধন করিয়া রাবণের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির (কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ ইত্যাদি) মধ্যে দেখিতে পাই, রাবণ নিয়তি বা বিধির অমোঘ নির্দেশ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু ভীরুর মত নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সেতু-বন্ধনের মধ্যে আর্ষ রামায়ণের রাবণও সুস্পষ্ট-ভাবে এই বিধাতার হস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রামচন্দ্র সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে লঙ্কেশ্বর রাবণ শুক ও সারণ নামক মন্ত্রিদ্বয়কে বলিতেছেন—

'ন দৃষ্টং ন শ্রুতং চাপি সাগরে সেতুবন্ধনম্।
নূনমস্মদ্বিনাশায় বিধিনা দোঃ প্রসারিতঃ'॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ১।৩)

সমুদ্রে সেতুবন্ধন কেহ কখনও দর্শন করে নাই বা ইহার কথা কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই ; নিশ্চয় বিধি আমাদের বিনাশের জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধে চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের এই উক্তি স্মরণ করুন—

'বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে'।

স্বর্ণলঙ্কার সীমাহীন ঐশ্বর্য এবং রাবণের সুমহান বীর্য, দুর্জয় পৌরুষ ও প্রবল প্রতাপ মধুসূদনের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, বিদ্রোহী কবির চোখে রাবণ মহিমমণ্ডিত পুরুষ। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির হস্তে এই সমুন্নতশীর্ষ পুরুষের পরাজয়ই মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু। ঊর্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণের দিব্যাস্ত্রলাভ, মহামায়ার অনুগ্রহে বিভীষণের সহিত তাঁহার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ ও নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ—এ-সকলও দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই লীলা। মেঘনাদবধে বিভীষণ স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্বেষী, বিশ্বাসহন্তা, রক্ষঃকুলকালি, আর ইন্দ্রজিৎ কর্বুরগৌরবরবি, তিনি আপন দৃপ্ত পৌরুষে ও তারুণ্যের উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্যে নিয়তিকে উপেক্ষা করেন। মধুসূদনের লিপিকুশলতার গুণে প্রত্যেকটি রাক্ষস-চরিত্র রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্যে মানব-জীবনে নিষ্ঠুর নিয়তির-লীলা দেখিয়া আমরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। মেঘনাদবধের সর্বত্রই যেন আমরা ক্ষুব্ধ সাগরের গর্জন ও সীমাহীন রিক্ত হাহাকার শুনিতে পাই। প্রাক্-মধুসূদন যুগে আমরা বাংলার কাব্যে শুনিয়াছি ঝরনার নূপুর-ধ্বনি অথবা শীর্ণকায়া তটিনীর কুলুকুলু ধ্বনি, মধুসূদন আমাদিগকে শুনাইলেন অনন্ত সাগরের গভীর গর্জন ও মর্মবিদারী ক্রন্দন, আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ, স্তম্ভিত হইয়া সেই অশ্রুতপূর্ব উদাত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

মধুসূদনের ভাব-কল্পনার মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব সম্পর্কে এ-যুগের পাঠক দ্বিধাহীন, নিঃসংশয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-যুগে যাঁহারা মেঘনাদবধের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা অনেকেই মহর্ষি বাল্মীকির অমর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত নহেন। তাই তাঁহারা মনে করেন, রামায়ণের রাবণ বুঝি দশাস্য বিংশতিভুজ কিম্ভূত-কিমাকার ভয়ঙ্করদর্শন রাক্ষসমাত্র, বাল্মীকির অঙ্কিত রাক্ষস-চরিত্র বুঝি মানবীয় উপাদানের অভাবে কোথাও আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে না, মহর্ষি বুঝি বিভীষণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া কোথাও তাহার স্বজাতিদ্রোহিতার সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত করেন নাই, আর মেঘনাদকে তিনি বুঝি শুধু মায়াবী, কপট যোদ্ধারূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। আর্য

রামায়ণ সম্পর্কে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার জন্য মধুসূদনের সমালোচকগণ হয়তো অনেক পরিমাণে দায়ী।

রাবণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই রামায়ণের অনেক স্থলে 'মহাত্মা রাবণ' কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে। হনুমান রাবণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—অহো কী সীমাহীন ঐশ্বর্য, কি দুর্জয় পৌরুষ, কি দুর্ধর্ষ পরাক্রম! ইনি যদি পাপে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ত্রিলোকের অধীশ্বর হইতে পারিতেন। মেঘনাদ-বধে আমরা রাবণ ও প্রমীলার মুখে 'ভিখারী রাঘব' কথাটি শুনিতে পাই। প্রমীলার চরিত্র অবশ্য শ্রীমধুসূদনেব অপূর্ব সৃষ্টি, কিন্তু আর্ষ রামায়ণে লঙ্কেশ্বর রাবণের মুখেও অনেক স্থলে এই কথাটি শুনিতে পাই। ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাম ও লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন 'মিথ্যাপ্রব্রজিতৌ' বা কপট সন্ন্যাসী (যুদ্ধকাণ্ড, ১৯।৫১)। লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের পর আমরা রাবণের মুখে যে বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে পাই, তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মভেদী। রাবণের বিলাপের মধ্যে তাঁহার স্নেহ-বৎসল পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় রহিয়াছে—

'যৌবরাজ্যং চ লঙ্কাং চ রাক্ষসৈশ্বর্যমেব চ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্যাঞ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্যাণি কার্যাণি বিপরীতং হি বর্ততে॥' (যুদ্ধকাণ্ড, ৭৩-১৫-১৬)

হা রাক্ষস মেঘনাদ, তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কার ঐশ্বর্য, জনক-জননী ও ভার্যাকে (মেঘনাদপত্নীর উল্লেখ এই একটিবার মাত্র আমরা পাই), পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় প্রস্থান করিলে?

হে বীর, আমি যমালয়ে গমন করিলে আমার প্রেতকার্য তোমার করণীয় ছিল, কিন্তু আজ আমাকেই কিনা তোমার প্রেতকার্য করিতে হইতেছে।

অবশ্য মেঘনাদবধের নবম সর্গে মেঘনাদের চিতার নিকট রাবণের বিলাপ আরও করুণ, আরও মর্মভেদী। মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার চিতারোহণে আছে প্রেমের বীর্যের পরাকাষ্ঠা।

রাবণকে মাতামহ মাল্যবান, সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ, ভ্রাতা বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ সকলেই হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু রাবণ যেন কালপ্রেরিত হইয়াই রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। রাম-রাবণের যুদ্ধ মহর্ষি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের প্রচণ্ড মহিমা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অবশ্য, পরবর্তী কালে রাবণ প্রতিকূলভাবে ভগবদারাধনার দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির সমগোত্রীয় হইয়াছেন, কিন্তু সে-কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

রামায়ণে রাক্ষস মাত্রেই দুর্বৃত্ত নহেন, ধর্মপথগামী নিশাচর অনেক রহিয়াছেন। রাক্ষস-রমণীগণের মধ্যে মধুরভাষিণী, সীতার পরম হিতৈষিণী সরমাকে আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, বৃদ্ধা ত্রিজটাও আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। শ্রীমধুসূদন সীতা ও সরমার কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয়ের চরিত্র-মাধুর্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মায়াবী হইয়াও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সম্মুখ-সংগ্রামে তিনি অপরাজেয়। সত্য বটে, তিনি মায়া অবলম্বনে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করেন, মায়াসীতা বধ করিয়া স্বয়ং হনুমানের মনেও বিভ্রান্তি উৎপাদন করেন, কিন্তু যেখানে তিনি লক্ষ্মণের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেখানে বহুক্ষণ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল, কেননা

'উভৌ পরমদুর্ধর্যাবুভৌ পরমতেজসৌ।
যুযুধাতে মহাবীরৌ ব্যাঘ্রকেশরিণাবিব'॥ (যুদ্ধকাণ্ড. ৬৮।৩১)

তাঁহারা উভয়েই পরম দুর্ধর্ষ, উভয়েই পরমতেজস্বী, সেই মহাবীরদ্বয় ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মেঘনাদ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, কিন্তু তাঁহার আত্মশ্লাঘা আপন পৌরুষ সম্পর্কে অস্ত্রকুশলী যোদ্ধার সচেতনতা মাত্র। লক্ষ্মণের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মেঘনাদ যখন নিহত হইলেন, তখন

'শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুঃ সমরে গতজীবিতঃ'॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ৭১।৫০)

যুদ্ধে প্রাণহীন সেই মহাবাহু শান্তরশ্মি রবি ও নির্বাপণপ্রাপ্ত পাবকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

শ্রীমধুসূদনের 'কর্বুরগৌরবরবি চিররাহুগ্রাসে' অথবা 'লঙ্কার পঙ্কজরবি গেল অস্তাচলে' মহর্ষি বাল্মীকির 'শান্তরশ্মিরিবাদিত্যঃ' কথারই প্রতিধ্বনি।

আর্ষ রামায়ণে বিভীষণ একটি বিশিষ্ট চরিত্র। রাবণকে সৎপথে প্রবর্তিত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যখন তিনি ব্যর্থকাম হইলেন, যখন তিনি রাবণ কর্তৃক অবমানিত ও পদাঘাতে জর্জরিত হইলেন, তখন পরম অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাঘবপক্ষে যোগদান করিলেন। ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি পরপক্ষকে আশ্রয় করিয়া স্বজাতিদ্রোহী হইলেন। তাই বিভীষণের চরিত্রে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। রাবণবধের পর তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মর্মভেদী। বিভীষণ স্বহস্তে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি সহায় না হইলে লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজিতের নিধন সম্ভবপর হইত না। তিনি বলিয়াছেন—

'অযুক্তং নিধনে কামং পুত্রস্য যতিতুং ময়া।
ন তু মে রামতুষ্ট্যর্থমকার্যং ভুবি বিদ্যতে ॥
ঘৃণামপাস্য রামার্থে হনিষ্যে ভ্রাতুরাত্মজম্।
প্রহর্তুকামস্য তু মে বৈক্লব্যং জায়তে মহৎ'॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ৭০।১৫,১৭)

পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনে যত্নবান হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়, তথাপি রামচন্দ্রের সন্তোষবিধানের জন্য আমার অকার্য কিছুই নাই।

দয়া বিসর্জন দিয়া রামচন্দ্রের জন্য ভ্রাতৃপুত্রকে বধ করিব, কিন্তু মেঘনাদকে প্রহার করিতে গেলেই আমি ভয়ানক বিহ্বল হইয়া পড়ি।

আর্ষ রামায়ণে দেখিতে পাই, রণদুর্মদ ইন্দ্রজিতের হোম-সমাপ্তির পূর্বেই লক্ষ্মণ যখন তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সঙ্গে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের তিরস্কারবাক্য মধুসূদন প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, মধুসূদনের মেঘনাদ এ-অবস্থায়ও

পিতৃব্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের মেঘনাদ কোথাও পিতৃব্যের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। মেঘনাদ বিভীষণকে বলিয়াছেন—

'ন জ্ঞাতিত্বং ন ভ্রাতৃত্বং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌহার্দ্যং ন ধর্মো ধর্মদূষক ॥
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচপরাশ্রয়ঃ ॥
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব চ' ॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭।১২-১৫)

হে ধর্মদূষক দুর্বুদ্ধে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, সৌহার্দ্য, ধর্ম কিছুই তোমার নিকট আদরণীয় হইল না।

হে দুর্মতে, তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয় হইয়াছ, যেহেতু তুমি স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিতেছ।

স্বজনের সঙ্গে বসতি ও অধম শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ, ইহাদের মধ্যে যে কত পার্থক্য, তাহা তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

শত্রু যদি গুণবান এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তথাপি গুণহীন স্বজনই শ্রেয়; পর চিরদিনই পর থাকে, সে কখনও আপন হইতে পারে না।

মেঘনাদবধে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উক্তি—

'ধর্মপথগামী
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা'।

মেঘনাদবধে বিভীষণের চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নাই, সে আপনাকে ধর্মপথগামী বলিয়া জানে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসহন্তা, রক্ষঃকুল-কলঙ্ক। কিন্তু রামায়ণে বিভীষণ-চরিত্র জটিলতর। রাবণবধের পর শোকাকুল বিভীষণ বিলাপ করিতেছেন—

'বীর বিক্রান্তবিখ্যাত যুদ্ধে সর্বাস্ত্রকোবিদ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষে হা হতো ভুবি ॥
নিঃক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজৌ চন্দনভূষিতৌ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চসা' ॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ৯৪।১১-১২)

হায়, বিখ্যাত পরাক্রমশালী বীর, যুদ্ধে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ তুমি, মহার্ঘ শয্যায় শয়নের যোগ্য তুমি, তুমি কেন আজ চন্দনভূষিত নিশ্চেষ্ট দীর্ঘ বাহুদ্বয় (এখানে 'বাহুদ্বয়' কথাটি লক্ষণীয়) নিক্ষেপ করিয়া ধরাশায়ী হইয়াছে ? ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল মুকুট তোমার মস্তক হইতে স্খলিত হইয়াছে।

নিহত ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া বিভীষণ বলিয়াছেন—'আদিত্য যেন আজ ভূমিতে পতিত হইল, চন্দ্রমা যেন অন্ধকারে মগ্ন হইল, দীপ্ত বহ্নিশিখা যেন শত ঘটের জলে সিক্ত হইয়া প্রশান্ত হইল'। বিভীষণের মুখে আমরা শুনিতে পাই, রাবণ ছিলেন আহিতাগ্নি, মহাতপা, বেদান্তের পারগামী। স্বয়ং রামচন্দ্রও রাবণের গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, বাল্মীকির রাবণ কি মহামহিমান্বিত পুরুষ নহেন ?

অনেক সময়, মধুসূদন প্রয়োজনের অনুরোধে রামায়ণের কোন কোন উক্তি বিভিন্ন পাত্রের মুখে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যে-সময়ে রামচন্দ্র ও রাবণের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে, সেই সময়ে বাল্মীকির রামচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিতে পাই—

'অস্মিন্ মুহূর্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ যূথপাঃ'। (যুদ্ধকাণ্ড, ৮২।১০)

হে যূথপতিগণ, এই মুহূর্তে তোমাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা অচিরেই পৃথিবী অরাবণ বা অরাম (রাবণশূন্য বা রামশূন্য) দেখিতে পাইবে।

মেঘনাদবধে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই লঙ্কেশ্বর রাবণের মুখে। বীরবাহু-বধের পর ক্ষুব্ধ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প করিয়া বলিতেছেন—

'সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ,
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি,
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি'।

রামায়ণে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বলিয়াছিলেন—

'অন্তর্ধানগতেনাবাং যৎ ত্বয়া ছলিতৌ রণে।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ শূরনিষেবিতঃ'॥

তুমি যে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছ, এ-পথ তস্করের যোগ্য, বীরের যোগ্য নহে।

মেঘনাদবধে লক্ষ্মণ যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে আঘাত করিতে উদ্যত, তখন মেঘনাদ বলিয়াছিলেন—নিরস্ত্রকে আঘাত করা কি ক্ষাত্রধর্ম? 'বল মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা'?

আমরা বলিয়াছি, শ্রীমধুসূদন দেশ-বিদেশের কাব্যোদ্যান হইতে মধু চয়ন করিয়া এক অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মধুচক্র-নির্মাণের গৌরব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রাপ্য। কিন্তু শুধু মধুক্রম-নির্মিতির কৃতিত্ব নয়, মধু আহরণের যে শক্তি তাঁহার ছিল, তাহাও অনন্য-দুর্লভ। বিদেশী কাব্যগ্রন্থের মত বাল্মীকির রামায়ণও তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে বাল্মীকির অনুগামী হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গৌরব বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। আত্মশক্তি-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্তফুলবনমধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

জীবনদর্শন : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

সেদিন আমাদের ঘরোয়া মজলিশে নাটক সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে বন্ধু বলিলেন, "আমার মনে হয়, নাটক-সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুদের চেয়ে প্রাচীন গ্রীকদের রসবোধ সূক্ষ্মতর ছিল। এইজন্য গ্রীক নাট্যকারেরা অনেক উৎকৃষ্ট বিষাদান্ত নাটক বা 'ট্র্যাজিডি' রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অলঙ্কার-শাস্ত্রে ট্র্যাজিডির রচনা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর ভারতের নাট্যকারেরা নির্বিচারে আলঙ্কারিকদের বিধানই মান্য করিয়া লইয়াছেন। তাই সংস্কৃত নাটকে, অন্তত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনায়, কাব্য-সৌন্দর্যের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু গভীর জীবন-দৃষ্টির পরিচয় নাই।"

আমি সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, কথাটা অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু কেহই এই কথাগুলির বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তির অবতারণা করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ আমায় কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "বন্ধুর কথাগুলি নির্বিচারে মানিয়া লইব না বটে, কিন্তু আমি প্রস্তাব করি, আজিকার অধিবেশন এইখানে মুলতবি থাকুক। আমরা আগামী বৈঠকে এ-বিষয়ে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে আমরা সবাই যুদ্ধে জয়ী হইবার মত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে মন দিব, বন্ধুকেও যোদ্ধৃবেশে উপস্থিত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে।"

আমার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

বন্ধুর মনে যে প্রশ্নটি জাগিয়াছে, সেটি অতি পুরাতন প্রশ্ন—ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিষাদান্ত নাটকের রচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? যে-দেশে মহর্ষি বাল্মীকির 'শোক' তাঁহার কণ্ঠে বাণীরূপ লাভ করিয়া শ্লোক নামে আখ্যাত হইয়াছিল, যে-দেশে মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভূতলে অতুল করুণরসাত্মক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যে-দেশের প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছিলেন—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥"

(করুণ প্রভৃতি রসে যে অনির্বচনীয় সুখ উৎপন্ন হয়, সহৃদয় বা রসিকদিগের অনুভূতিই সে-বিষয়ে প্রমাণ।)

—সে-দেশে ট্র্যাজিডি নিষিদ্ধ হইল কেন, সে-প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিয়াছে এবং কেহ কেহ ইহার উত্তর দিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করিতে হয়।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে-পার্থক্য এই—প্রাচীন গ্রীকগণ নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ভারতীয়গণ নিয়তিবাদকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রীক দৃষ্টিতে নিয়তি অন্ধ, নির্মম, মানুষের জীবন এই নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই, তাই জগতের হিতকামনা হৃদয়ে স্থান দিয়াও প্রমিথিউসকে শৃঙ্খলিত হইতে হইয়াছিল। ভারতীয় দৃষ্টিতে "নিয়তি" কথার অর্থ "নিয়ম", "অদৃষ্ট" বা "দৈব" কথার অর্থ "প্রাক্তন কর্ম", মানুষ অনেক সময় তীব্র পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে অভিভূত করিতে বা হীনবল করিতে পারে। অবশ্য দৈব যেখানে প্রবল, সেখানে পুরুষকার ব্যর্থ হয়; তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করি, ইহা সত্য; আবার প্রত্যেকেই যে নিজের ভাগ্য-বিধাতা, এ-কথাও সত্য। আমরা মানুষের খণ্ডিত জীবন দেখি বলিয়াই বুঝিতে পারি না, বহু ধার্মিক ব্যক্তিকেই বা কেন অন্তহীন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর পাপাচার দুর্বৃত্তই বা কেন অনেক সময়ে সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়। আমরা প্রাচীন ইহুদীদের মত বলিতে চাহি না, যে ধার্মিক ব্যক্তির ইহলোকে দুঃখভাগ হয়, সে অন্তরে পাপী। আমরা জন্মান্তরে ও কর্মফলে বিশ্বাস করি। ওল্ড টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত বুক অব জোব নামক আখ্যানটির উপদেশ এই—ঈশ্বরের আদেশ পালন করিও,

কিন্তু তাঁহার কার্যের বিচার করিও না। তিনি কী কারণে পুণ্যাত্মাকে দুঃখ দেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। কিন্তু এ-ভাবে তো মানুষের জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করা যায় না। এ-বিষয়ে ভারতীয়দের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ এমন কোন কর্ম করে না যাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় না (অর্থাৎ মানুষের জীবনে কৃতপ্রণাশ নাই), আবার মানুষকে এমন কোন ফল (সুখ বা দুঃখ) ভোগ করিতে হয় না, যাহার মূলে তাহার কৃত কোন কর্ম নাই (অর্থাৎ মানুষের জীবনে অকৃতাভ্যুপগম হইতে পারে না)। অধ্যাত্ম রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্মসূত্রৈর্গ্রথিতো হি লোকঃ !"

(সুখ-দুঃখের দাতা কেহ নাই। অপরে আমাকে সুখ দান করে, ইহা কুবুদ্ধি, আমি অপরের সুখ বিধান করি, ইহা বৃথাভিমান, কারণ লোকসকল স্বকর্মসূত্রের দ্বারা গ্রথিত।)

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। এই আলোচনার সারমর্ম এই—প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্য-বিধাতা, যাহাকে দৈব বলি, তাহা প্রাক্তন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বুঝিতে পারিব, ভারতবর্ষে বিয়োগান্ত দৃশ্য-কাব্য রচিত হয় নাই কেন। (অবশ্য, প্রাচীন নাট্যকার ভাস একখানি বিষাদান্ত নাটক রচনা করিয়াছেন।)

বিষাদান্ত নাটকের মূল সূত্র কী ? সে বিষয়ে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলেন—"Freedom within, necessity without." যেখানে আমাদের অন্তরে স্ব-তন্ত্রতা, কিন্তু বাহিরে পরতন্ত্রতা, যেখানে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহিরের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না, সেখানে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির কাছে আমাদের পরাজয় ঘটে, সেই পরাজয়ই ট্র্যাজিডির গোড়ার কথা। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে এই পরাজয়ের কোন হেতু নাই,

কেননা, পূর্বজন্ম সেখানে স্বীকৃত হয় নই। মানুষের জীবনে এই পরাজয়ের ব্যর্থতাই ট্র্যাজিডির প্রতিপাদ্য বিষয়। আর যে-মানুষ যত মহৎ, যত শক্তিশালী, তাহার জীবনের ব্যর্থতা তত করুণ। অ্যারিস্টটল বলেন, ট্র্যাজিডি আমাদের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করিয়া আমাদের মনের নিরুদ্ধ বেদনাকে মুক্তি দান করে, তাই ইহা আমাদের মনের পক্ষে বিরেচন বা catharsis-এর ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। অবশ্য, যাহার চরিত্র আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতি আমাদের মনকে পীড়িত করে না। এইজন্য শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকে ইয়াগোর পরিণাম আমাদের মনকে আঘাত দেয় না, কিন্তু দেসদিমোনার হত্যাকাণ্ড এবং ওথেলোর প্রায়শ্চিত্ত আমাদের মনেক স্তম্ভিত করে। কেননা যদি এ-কথা স্বীকার করা যায় যে, তাহাদের চরিত্রের মধ্যেই ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত আছে, তথাপি তাহারা যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামায়ণে আমরা যখন রাবণবধ ও বিভীষণের বিলাপের কাহিনী পাঠ করি, তখন মহাশক্তি লঙ্কাধীশ্বরের পরিণতিতে আমরা যে ক্ষুব্ধ হই না, এ-কথা বলা যায় না, কেননা, রাবণ পাপাচারী হইলেও, তাঁহার চরিত্রে মহত্ত্বের উপাদান ছিল প্রচুর। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর এই বিপুলতম মহাকাব্যের যদি কেহ যথার্থ নায়ক থাকে, তবে সে মহাকাল, কারণ এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র মহাকালের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র, তাই মহাভারতের চেয়ে মহত্তর ট্র্যাজিডি পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যে রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। অতএব, .এথা যায়, যথার্থ ট্র্যাজিডির বিষয়বস্তু নিয়তির হস্তে সেই সকল পুরুষ বা নারীর পরাভব, যাহারা স্বীয় মহিমায় দেদীপ্যমান। এরূপ পরাভবের কাহিনী সংসারে বিরল নহে, তাই পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারগণ ট্রাজিডির উপকরণ পাইয়াছেন প্রচুর। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিতে এরূপ পরাজয়ের মূলে আছে দৈব বা প্রাক্তন কর্ম। সামাজিকগণের নিকট এইরূপ বিষাদান্ত নাটকের অভিনয় হইলে, তাহারা জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি হারাইয়া ফেলিতে পারে, তাহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে

পারে যে, মানুষ একান্তভাবে দৈবের অধীন, সুতরাং সংসারে সাধু প্রচেষ্টার কোন মূল্য নাই। ইহাতে মানুষ ধর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়, নাট্যকারও সাহিত্যের মধ্য দিয়া শিব-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। তাই, সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজিডির অসদ্ভাব দেখা যায়।

নাট্যকার যাহাতে সামাজিকের মনে কোন গুরুতর বিক্ষোভের সৃষ্টি না করেন, সেদিকেও ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের লক্ষ্য ছিল। এইজন্য রঙ্গমঞ্চে রোদন, বধ, কেশাকর্ষণ প্রভৃতির প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছিল। যাহাতে দর্শকদের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ঘটে, এরূপ কোন দৃশ্যের অবতারণাও প্রতিষিদ্ধ ছিল। যাঁহারা বেণীসংহার, শকুন্তলা প্রভৃতি নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার দৃষ্টান্ত সহজেই পাইবেন। এ-স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীসদেশেও রঙ্গমঞ্চে হত্যা-প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছিল।

স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, প্রাচীন ভারতীয়গণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যকে দেখেন নাই। তাঁহারা কলাকৈবল্যবাদে (আর্ট ফর্ আর্টস সেক) বিশ্বাসী ছিলেন না। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, কাব্যের দ্বারা অল্পধী ব্যক্তিও সহজে চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, নাটকের দ্বারা ত্রিবর্গ লাভ হয়। আর একজন খ্যাতনামা আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, কাব্যের দ্বারা যশোলাভ হয়, অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, লোকব্যবহার জ্ঞাত হওয়া যায়, শিবেতর বা অমঙ্গলের বিনাশ হয়, পরমা নির্বৃতি বা আনন্দ লাভ হয়, আর সর্বোপরি কাব্য আমাদিগকে কান্তার মত উপদেশ প্রদান করে (বন্ধু বা গুরুর মত নয়)। এ-সকল কথা আমাদের কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের শিব-আদর্শ সম্বন্ধে যে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ নিঃসংশয় ছিলেন, এ-কথা অনস্বীকার্য।

"সাহিত্য" কথাটিতে একদিকে যেমন মিলনের ভাব, তেমনই অপর দিকে একটা কল্যাণের ভাবও আছে। আলঙ্কারিক কুন্তক বলেন, সাহিত্যে আমরা পাই সুহৃদ যুগলের ন্যায় বাক্ ও অর্থের মিলন, ইহারা পরস্পরের সহিত স্পর্ধা করিয়াই রমণীয়তা লাভ করে। শুধু তাই নয়, সাহিত্যে আছে শব্দের সহিত

শব্দের মিলন, অর্থের সহিত অর্থের মিলন, বাক্যের সহিত বাক্যের মিলন। এই তো গেল মিলনের দিক। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইহাতে একটি কল্যাণের দিকও আছে। হিতের বা কল্যাণের সহিত যাহা বর্তমান তাহাকে বলি স-হিত, সেই সহিতের ভাবকে বলি সাহিত্য। সাহিত্য আমাদিগকে প্রেয়ের পথ নির্দেশ করে না, শ্রেয়ের বা কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য-সৃষ্টিই সাহিত্যের প্রাণ, প্রাচ্যের দৃষ্টিতে রস-সৃষ্টিই সাহিত্যের প্রাণবস্তু। এ-রসের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে কাব্যরচনার মূলে থাকে সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা। কাব্য-সিসৃক্ষা অবশ্য ইন্দ্রিয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষার মত স্থূল নয়, তবে ইহার পশ্চাতে লোক-কল্যাণের কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় নাই (এখানে আধুনিক প্রচারধর্মী সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে না)। বেদে পরব্রহ্ম-সম্পর্কে বলা হইয়াছে, এই বিশ্ব তাঁহার কাব্য অর্থাৎ এই বিশ্ব শুধু তাঁহার আনন্দের প্রকাশ নয়, এই বিশ্ব-রচনার মূলে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সক্রিয়। কবির সৃষ্টি সম্পর্কেও তাই। ভারতীয় দৃষ্টিতে কবির রচনা আনন্দের প্রকাশ বটে, কিন্তু তাঁহার শুভবুদ্ধি সৃষ্টিকর্মের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। তাই সাহিত্য মানুষকে প্রেয়ের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে আকর্ষণ করে। দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দৃষ্টিতে জীবনের জন্যই সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য জীবনকে সুন্দরতর, মধুরতর ও সার্থকতর করিয়া তোলে।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যে-কথা সত্য, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে সে-কথা অধিকতর সত্য। ইংরেজীতে ফিলজফি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানে অনুরক্তি (Love of knowledge), আর আমাদের দেশে "দর্শন" মানে "উপলব্ধি" অথবা "দৃষ্টিভঙ্গি।" অ্যারিস্টটল বলেন, মানব-মনের বিস্ময় হইতেই জ্ঞানের জন্ম। বাস্তবিক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎপত্তির মূলে আছে মানুষের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তাই ইহা মানুষের বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের মূলে জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজন, সে-প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি, মুক্তি, নির্বাণ

প্রভৃতি। অবশ্য, একমাত্র চার্বাকদর্শন সম্পর্কে এ-কথা খাটে না। ভারতীয় দর্শন এক অখণ্ড বস্তু, ইহাতে মনোবিজ্ঞান আছে, চরিত্র-নীতি আছে, আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু ভারতে মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক শাস্ত্ররচনার আবশ্যক হয় নাই। আজ প্রতীচ্যের মনোবিজ্ঞান দর্শন হইতে পৃথক হইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। ইহা আজ মানুষকে ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আবার "ভাল" ও "মন্দ" বা "সু" ও "কু"র মানদণ্ড কী, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে চরিত্র-নীতির জন্ম হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদ্যা ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আবার ভারতীয় দর্শনে যেমন বিচারবিশ্লেষণ আছে, তেমনই সাধন-পদ্ধতি আছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শন কোন সাধনপদ্ধতির কথা ভাবিতেই পারে না। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের জন্ম হইয়াছে জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে, আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনের জন্ম হইয়াছে মানুষের কৌতূহল-নিবৃত্তির প্রয়োজনে। তাই ভারতীয় দর্শন একটি অখণ্ড বস্তু (Synthetic) আর প্রতীচ্য দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত।

কিন্তু মানুষের জীবন যদি অখণ্ড বস্তু হয়, তবে মানুষী সৃষ্টিও অখণ্ড বস্তু। কবিগণের নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি যাহা সৃষ্টি করে, তাহাকে আমরা বলি কাব্য। এখন প্রশ্ন এই : ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কাব্য-বিচারে এই অখণ্ড দৃষ্টির পরিচয় দেন নাই কেন? তাঁহারা কাব্যদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবের বিচার করিয়াছেন, প্রত্যেকটি শ্লোক বা বাক্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন এবং সে-আলোচনায় যথেষ্ট নৈয়ায়িকী বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রতীচ্যের সমালোচকদের মত সমগ্রভাবে কোন কাব্যের উপর আলোক-সম্পাত করেন নাই বা কবিমানসের ধারা অনুসরণ করেন নাই। এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্য-বিচারে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রতীচ্যের সমালোচক কাব্যের মধ্য দিয়া কবিকে আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন, আর আমাদের দেশের সমালোচক কবির ব্যক্তি-সত্তাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বচন-রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করিয়াছেন। সাহিত্যবিচারে

এই উভয় পদ্ধতিরই সার্থকতা আছে। আবার এ-কথাও সত্য যে, খণ্ডের মধ্য দিয়াও আমরা অখণ্ড বস্তুকেই আস্বাদন করি। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, অখণ্ড শুধু খণ্ডের সমষ্টি নয়, ইহা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ যাহা খণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান।

ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কাব্য-বিচারে প্রতি পদে এমন বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন কেন? কারণ, তাঁহারা জানিতেন বাণী ব্রহ্ম; তাই যাঁহারা বাণী-ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের কর্তব্য অতি দুরূহ। তাঁহারা কবিকে কোথাও ফাঁকি দিবার সুযোগ দেন নাই, দোষযুক্ত রচনার প্রাচুর্যের দ্বারা সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিবার অধিকার দেন নাই। এখানেও তাঁহারা সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। কবি-কৃতি যাহাতে সহৃদয়গণের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায়, কোন কাব্যের অংশবিশেষও যাহাতে রসিকগণের চিত্তে পীড়া উৎপাদন না করে, সাহিত্যের কমলবনে যাহাতে মত্ত-হস্তীর উপদ্রব না হয়, অক্ষম লেখকের রচনা-ভারে যাহাতে সাহিত্যের জঞ্জাল জমিয়া না উঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে হয়তো সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইয়াছে, কিন্তু মানুষের শক্তির অপচয়ও অনেকটা নিবারিত হইয়াছে।

সুতরাং যেমন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে, তেমনই ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রেও একটা জীবন-দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। প্রতীচীর জীবন-দৃষ্টি ও প্রাচীর জীবন-দৃষ্টিতে পার্থক্য আছে। সাহিত্য-দর্শনে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই পার্থক্যের কতটা পরিচয় রহিয়াছে, আমরা তাহার দিগদর্শন করিলাম। আমরা দেখিলাম, ভারতীয় দৃষ্টিতে জীবন অর্থে শুধু ব্যবহারিক জীবন বা মর্ত্য জীবন নয়, শুধু দেহবদ্ধ জীবন বা মনোজীবনও নয়, জীবন অর্থে একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাই এ-দেশের সকল বিদ্যাই লোকদ্বয়-সাধনী।

ভগবান্ তথাগতের 'অগ্নি-উপদেশ'

আকাশের উদারতা, সাগরের গভীরতা, বজ্রের কঠোরতা ও কুসুমের পেলবতা যে লোকোত্তর পুরুষের জীবনে অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছিল, যাঁহার 'কথামৃত' পান করিয়া একদিন বিশ্বের ত্রিতাপ-দগ্ধ নরনারীর প্রাণ শীতল হইয়াছিল, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' যিনি নানা দিগ্দেশে 'সদ্ধর্ম' প্রচার করিয়াছিলেন এবং যিনি অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে সর্বজনের মনো-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যচরিত উজ্জ্বল অম্লান দীপশিখার মত আমাদের গহন অন্ধকার পথকে আলোকিত করুক। আজিকার দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় দ্বেষ-হিংসা-জর্জর পৃথিবীকে ভগবান তথাগতের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী মহতী বিনষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা করুক। সম্যক সম্বুদ্ধের বিশুদ্ধ উপদেশরূপ অঞ্জন-শলাকা কোটি কোটি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ নরনারীর চক্ষু উন্মীলিত করুক। ভগবান বুদ্ধের সার্দ্ধ-দ্বিসহস্রতম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্বের অন্তর হইতে এই আকুল প্রার্থনাই ধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়,—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভূটান, তিব্বত, শ্যাম, মালয়, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও এই জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক অপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই বিপুল উৎসবের সকল আয়োজন ব্যর্থতায় পরিণত হইবে, যদি না ইহা আমাদের মধ্যে নবজন্ম-লাভের প্রেরণা জাগায়, যদি না ইহা আমাদিগকে আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গের অনুসরণে প্রোৎসাহিত করে। শ্রেয়ের পথ চিরদিনই ক্ষুরের ধারার মত নিশিত ও দুরত্যয়, তাই আমরা যেন দুর্গম পথের যাত্রী হইবার জন্য অমোঘ বীর্য্য ও অবিচলিত অধ্যবসায়কে আমাদের পাথেয় করি। কেননা, ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্মে একদিকে যেমন অন্ধ বিশ্বাসের, অপর দিকে তেমনি দৈবী বা মানুষী কৃপার কোন স্থান নাই। সে ধর্মের অবলম্বন—তীব্র পুরুষকার, অবিচল স্থৈর্য্য, অমোঘ বীর্য্য ও দুঃখ-বরণের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। এ ধর্মে

আলস্য, জড়তা, অবসাদ, প্রমত্ততার স্থান নাই। তাই সদ্ধর্মে-দীক্ষাকে আমরা বলিতে চাই—আগ্নেয়ী দীক্ষা।

আমরা বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব, সম্বোধি-লাভ ও পরিনির্বাণ লাভের পরম পুণ্যতিথিতে তাঁহার এই 'আগ্নেয়ী দীক্ষার' কথাই স্মরণ করি। তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—বাহিরে সমিদ্ধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া আমরা পরম পুরুষার্থ বা সর্বোত্তম মঙ্গল লাভ করিতে পারি না, অন্তরে নিরন্তর জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখিলেই আমরা নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারি। যে ত্রিবিধ দুঃখরূপ অনল আমাদিগকে অনুক্ষণ দগ্ধ করিতেছে, সেই অনল শীতল বারির দ্বারা নির্বাপিত হইবার নহে, জ্ঞানাগ্নির দ্বারাই এই ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত করিতে হয়। এ যেন 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে: বিষের ঔষধ বিষ বটে কিন্তু সমজাতীয় বিষ নহে। তাই জঙ্গম বিষের চিকিৎসা করিতে হয় স্থাবর বিষের সাহায্যে। কাহাকেও সর্পাদিতে দংশন করিলে তাহার উপর স্থাবর বিষেরই প্রয়োগ করিতে হয়। তেমনই বুদ্ধদেব আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—জ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াই ত্রিতাপাগ্নির দাহ নিবৃত্তি করিতে হয়।

বুদ্ধদেব গয়াশীর্ষ পাহাড়ে শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 'অগ্নি-উপদেশ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন:

'হে ভিক্ষুগণ, সংসারে সকলই দীপ্যমান। চক্ষু, রূপ, চক্ষুর সংযোগ হেতু সুখ বা দুঃখের অনুভূতি, শ্রোত্র, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায়, স্পর্শ, মন, মনোধর্ম, মনঃসংস্পর্শজনিত সুখ বা দুঃখের অনুভূতি সকলই জ্বলিতেছে। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ অগ্নির দ্বারা, জন্ম, জরা ও মৃত্যুরূপ অগ্নির দ্বারা, শোক ও দুঃখরূপ অগ্নির দ্বারা সকলই দীপ্ত রহিয়াছে।

সকল পদার্থের এই স্বরূপ দর্শন করিয়া জ্ঞানবান শিষ্যের চক্ষুতে, রূপে, চক্ষুঃসযোগ হইতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখে, শ্রোত্র ও শব্দাদিতে, ঘ্রাণ ও গন্ধাদিতে, জিহ্বা ও রসাদিতে, দেহ ও স্পর্শাদিতে, মনে, মনোধর্মে ও মনঃসংস্পর্শ হইতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখে নির্বেদ উৎপন্ন হয়। এই নির্বেদ উৎপন্ন হইলেই মনে

বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বৈরাগ্য জন্মিলেই মানুষ বাসনাকে অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধদেবের এই উপদেশের মধ্যেই তাঁহার জীবন-দর্শন নিহিত রহিয়াছে। আমরা সংসাররূপ দাবানলে দগ্ধ হই বটে কিন্তু কিছুতেই আমাদের চৈতন্যের উদয় হয় না। পতঙ্গ 'দাহার্তি' জানে না, তাই সে অন্ধ আবেগে দীপশিখার দিকে ধাবিত হয়; আর আমরা জানিয়া শুনিয়াও মোহবশতঃ দীপ্ত অনলশিখার দিকে ছুটিয়া যাই। ভগবান তথাগত তাঁহার 'অগ্নি-উপদেশে' আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত যে দহন-জ্বালা সহ্য করিতেছি, সেই চিন্তাকে মনে জাগ্রত রাখিতে হইবে এবং বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভগবান তথাগতের 'অগ্নি-উপদেশ' শুধু উপরের কয়েকটি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অগ্নি পৃথিবীর আবর্জনা দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে, তাই ইহা পরম পাবন। আবার স্বর্ণের বিশুদ্ধিও একমাত্র অগ্নিতেই পরীক্ষিত হয়। ('হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।) বুদ্ধদেব আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, অন্তরে সর্বদা উৎসাহরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আলস্য, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। আর এই অগ্নির সংস্পর্শেই আমাদের দেহ-মন ধীরে ধীরে পবিত্র হইবে। ভগবান তথাগত যেখানে আমাদিগকে বলিয়াছেন: 'তোমরা তীব্র বীর্য ও পুরুষাকারের দ্বারা আপন ভাগ্যকে গড়িয়া তোল,' সেখানে কি তিনি 'অগ্নি-উপদেশ' দেন নাই? বুদ্ধদেবের যে সকল বাণী আমাদিগের সুপ্ত বীর্যকে জাগ্রত করে এবং আমাদিগকে মনুষ্যত্বের সাধনায় প্রেরণা দেয়, সেই সকল বাণীকে কি 'অগ্নি-বাণী' বলা চলে না? যীশুখ্রীষ্ট পরবর্তী কালে যে Baptism with Fire এর কথা বলিয়াছেন, সেই Baptism with Fire কি বস্তু, ভগবান তথাগতের চরিত আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

অন্তরে তেজোরূপ অগ্নিকে সর্বদা দীপ্যমান রাখিয়াছিলেন বলিয়াই সিদ্ধার্থ একদিন যথার্থই সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন।

কলনাদিনী তটিনীর তীরে তরুমূলে এ কোন্ দিব্যকান্তি যুবক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন? তাঁহার দীপ্যমান বদনমণ্ডলে অনমনীয় দৃঢ়তার 'ছাপ' পরিস্ফুট। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' এই সঙ্কল্প লইয়াই তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে:

'এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া,
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে'।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

সঙ্কল্পে যিনি সিদ্ধার্থের মত দুর্জয়, সহস্র প্রলোভনে যিনি সিদ্ধার্থের মত অবিচলিত, একমাত্র তিনিই প্রবুদ্ধ হইতে পারেন। তথাগতের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, যিনি অনুক্ষণ অন্তরে অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিতে পারেন, তিনিই সম্যক সম্বুদ্ধ হইতে পারেন। এ অগ্নি বাহির হইতে সংক্রামিত করা যায় না, এ অগ্নি আমাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাই বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন: 'আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর'। বুদ্ধদেব আমাদিগকে দৈবকৃপা বা গুরুকৃপার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের আলোকে নির্ভয়ে চলিতে বলিয়াছেন, মানুষ যে স্বয়ং আপন ভাগ্যের নির্মাতা এ কথাও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বাস্তবিকই বৌদ্ধধর্ম বীর্যের ধর্ম, পুরুষকারের ধর্ম, সংগ্রামের ধর্ম; —আর ইহাই এই ধর্মের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

যোগাসনে সমাসীন সিদ্ধার্থ কি ভাবে অনমনীয় দৃঢ়তার বলে মারের প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, 'ললিতবিস্তরে' তাহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। মারের প্রতি তাঁহার উক্তিসমূহ স্মরণ করিলে আমাদের অন্তরে বলের সঞ্চার হয়, আমাদের প্রাণ তেজে, বীর্যে পরিপূর্ণ হয়। মারের প্রলোভন ও অপ্সরাগণের মায়াকে আপন বীর্যবলে পরাভূত করিয়াই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার যখন তিনি সম্বুদ্ধ হইয়া সদ্ধর্ম প্রচারের সংকল্প

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও মার তাঁহাকে পুনরায় একাকী নির্বাণানন্দ সম্ভোগে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন:

'কচ্ছপ যেযন নিজের মধ্যে অংগ সংহরণ পূর্বক সর্বদা সতর্ক ভাবে অবস্থান করে, তেমনই যিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন, তিনিই মারের প্রলোভনকে অতিক্রম করিতে পারেন'। বুদ্ধদেব কচ্ছপ ও শৃগালের গল্প বলিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কি ভাবে মারের প্রলোভনকে জয় করিতে হয়। এই মার বা কাম-দেব সর্বদাই চক্ষু. কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তাই আমরা রিপুর অধীন হইয়া পড়ি। যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা কিন্তু মারের প্রলোভনে বিচলিত হন না। এই 'মার' একটি রূপক, ইহা মনসিজ, অর্থাৎ মনেই ইহার উদ্ভব কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বা শক্তিকে তো অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধদেব যে ভাবে দুর্দমনীয় তেজের প্রভাবে মারের প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকের হয়তো কুমারসম্ভবে বর্ণিত মহাদেব কর্তৃক মদন-ভস্মের কথা মনে পড়িবে:

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং পতন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার'॥

এ ক্রোধ সে ক্রোধ নহে, যে ক্রোধসম্পর্কে বলা হইয়াছে: 'অক্কোধেন জিনে কোধং'; এ ক্রোধ সেই ক্রোধ, যাহাকে ঋষিগণ বলিয়াছেন 'মন্যু', আর ইংরেজিতে বলা হইয়াছে righteous indignation. মহাপুরুষগণ এই মন্যুর সাহায্যেই পুঞ্জীভূত অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সগর্বে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান, 'যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক'। ভগবান তথাগতের চরিত্রেও এই তেজ বা মন্যুর প্রাচুর্য্য ছিল। যীশুখৃষ্ট যখন বলিয়াছেন: 'Woe unto thee. scribes and Pharisees, hypocrites' অথবা যখন তিনি সয়তানকে বলিয়াছেন: Get thee behind me, Satan' তখন আমরা তাহার মধ্যেও এই মন্যুরই প্রকাশ দেখিতে পাই।

বৌদ্ধধর্ম শুধু মৈত্রী-ভাবনার ধর্ম নহে, ইহা সংগ্রামের ধর্মও বটে। এ সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম নহে বলিয়াই ইহাতে অধিকতর বীর্যের প্রয়োজন। তাই আজ ভগবান তথাগতের 'অগ্নি-উপদেশের' কথাই আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ'

আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন করিবে, আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। ইহা ভগবান তথাগতেরও উপদেশ।

বৌদ্ধধর্ম কি ভাবে মানুষের অন্তরে উৎসাহের অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া তাহাকে শুধু মানুষের নয়, সর্বভূতের কল্যাণ-সাধনে অনলস, অতন্দ্রিত করিয়া তোলে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ধর্মাশোক।

ভগবান তথাগাতের সার্দ্ধ-দ্বিসহস্রতম জয়ন্তী-উৎসবে আমরা ত্রিশরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই প্রার্থনা করি ঃ হে করুণাঘন, তুমি আমাদিগকে 'অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত' কর, যেন আমরাও অনলস, অপ্রমত্ত হইয়া লোক-কল্যাণের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি এবং সর্বপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন—দুর্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের প্রধান ঘটনা। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। দুর্বাসার অভিশাপেই দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল এবং সেই দাহনের মধ্য দিয়াই তাঁহারা নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। দুর্বাসার সেই বজ্র-গম্ভীর আহ্বান—'অয়মহং ভোঃ' মহাজীবনেরই আহ্বান; আমরা যখন শকুন্তলার মত আত্মসুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকি, তখন সে আহ্বান আমাদের শ্রুতিতে প্রবেশ করে না। যাঁহারা সে আহ্বান শুনিতে পান, তাঁহারই ধন্য। যাহারা সে আহ্বান শুনিতে পায় না, তাহাদের জীবনই হয় অভিশপ্ত। তাহাদের জীবন যেন জ্যামিতির বিন্দুর মত, উহার অবস্থিতি আছে কিন্তু দৈর্ঘ বা বিস্তৃতি নাই। সমাজ তাহাদের দ্বারে করাঘাত করে—'অয়মহং ভোঃ', স্বদেশ তাহাদের আহ্বান করে—'অয়মহং ভোঃ', বিশ্ব-মানবের মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি তাহাদের দুয়ারে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে—'অয়মহং ভোঃ', তাহারা আত্মসুখ চিন্তায় মগ্ন হইয়া সে আহ্বান শুনিতে পায় না।

সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্বে' ও 'ত্রিধারার' একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম আমরা বিবৃত করিলাম। আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁহাকে, যিনি এই আহ্বান শুনিয়া ঘরছাড়া হন এবং বহুর মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দেন, বহুর কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে সর্ববিধ দুঃখ দৈন্য, নির্যাতন-লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া লন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার উত্তরার্দ্ধে এই কথাগুলি অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই মহাজীবনের আহ্বান একদিন আসিয়াছিল ভগবান তথাগতের জীবনে, তাই তিনি এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার রজনীতে, কৌমুদীরাশিতে যখন বিশ্বজগৎ স্নাত, চরাচর যখন সুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন সেই সময়ে, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া

'মহানিষ্ক্রমণ' করিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের মতই তিনি শান্তির স্নিগ্ধ ধারা বিকিরণ করিয়া বিশ্বের দাব-দগ্ধ নর-নারীর অন্তরকে শীতল করিয়াছিলেন, তিনি যেন চন্দ্র-রশ্মি-সমূহেরই সংহত, ঘনীভূত মূর্তি, তাই ভগবান তথাগতের জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহের সঙ্গে তিথি-বিশেষের এই সংযোগকে আমরা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করি না।

ভগবান বুদ্ধকে বলা হইয়াছে 'তথাগত'। এই নামটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও অনেক 'বুদ্ধের' আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মতই তিনিও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই তিনি 'তথাগত' অর্থাৎ তথা আগতঃ (সেইরূপে আবির্ভূত)। আবার, বুদ্ধগণের ন্যায় যিনি নির্বাণ লাভ করিয়া তৃষ্ণাকে ক্ষয় করিয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছে, তিনি তথাগত অর্থাৎ তথা গতঃ (সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত)। ভারতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে যে বৈদিক ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, ইতিহাস তামার সাক্ষ্য প্রদান করে। কবি জয়দেব তাঁহার 'দশাবতার-স্তোত্রে' এইভাবে বুদ্ধদেবের স্তব করিয়াছেন ঃ—

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে।'

'হে কেশব, হে বুদ্ধরূপধারিন্, তুমি করুণার্দ্র চিত্তে পশুঘাত দর্শন করিয়া যজ্ঞবিধানোক্ত শ্রুতিবাক্য-সমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরে, তোমার জয় হউক।'

একদিন ব্যাধশরে আহত ব্যথা-কাতর ক্রৌঞ্চকে দর্শন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির 'শোক' শ্লোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইহারই ফলে জন্মলাভ করিয়াছিল সুরধুনীর ধারার ন্যায় পাবনী রামায়ণী কথা। যে-দিন তমসার তীরে মহর্ষি বাল্মীকি কবিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাসে সে এক পুণ্য দিন, যদিও ইতিহাস সেদিনের কোন সন্ধান দিতে পারে না। আবার

যেদিন দেবদত্তের শরে আহত মরাল-শিশুর বেদনা বুদ্ধদেবের হৃদয়কে করুণায় বিচলিত করিয়াছিল, সেইদিনই আমরা সিদ্ধার্থের করুণা-ঘন মূর্ত্তির প্রথম সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। এই করুণাই ছিল বৌদ্ধধর্মের উৎস। তাই আমি অন্যত্র বলিয়াছি—পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাকাব্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম উৎসারিত হইয়াছে সেই করুণা হইতে, যে করুণা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, সর্ব্বভূতের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করে।

কুমার সিদ্ধার্থ উদ্যানে ভ্রমণের কালে জরা ও ব্যাধির বীভৎসতা দেখিতে পাইলেন, জীবনের অনিবার্য পরিণামও প্রত্যক্ষ করিলেন। জীবনের অনিত্যতা, সংসারের নশ্বরতা ও ভোগ্য বস্তু-সমূহের ক্ষণভঙ্গুরতা তিনি উপলব্ধি করিলেন। জীব কেমন করিয়া দুঃখসাগর অতিক্রম করিতে পারে, এই একটি মাত্র চিন্তাই তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল। তিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া 'বহুকল্পদুর্লভা বোধি' লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মহানিষ্ক্রমণের পূর্বে শাক্যসিংহের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। শাক্যসিংহের মনকে সংসারে আসক্ত করিবার জন্য পিতা শুদ্ধোদন রাজ্যের সকল রূপযৌবন-সম্পন্না বিলাসকলানিপুণা নৃত্যগীতপটীয়সী নারীগণকে কুমারের প্রাসাদে আহ্বান করেন।

তিনি জানিতেন, এই সকল ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা ব্যবসায়িনীর দল যে মায়াজাল বিস্তার করিবে, সে জাল সিদ্ধার্থ ছিন্ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু কুসুম-সায়কের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, বিলাসিনীদের হাব-ভাব, ছলা-কলা সিদ্ধার্থকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তারপর যখন তিনি নিদ্রামগ্না সুন্দরীগণের বিপর্যস্ত কেশপাশ, বিপর্যস্ত বসন, লালাক্লিন্ন বদন প্রভৃতি দর্শন করিলেন, তখন সে দৃশ্য তাঁহার চক্ষে অতিমাত্রায় বীভৎস বলিয়া মনে হইল। তিনি চিরদিনের জন্য মোহপ্রবুদ্ধ হইলেন।

নিখিল বিশ্বের কল্যাণের জন্যই সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কেমন করিয়া মায়ার বন্ধন ছেদন করিবেন? সত্যই কি তিনি মোহ-প্রবুদ্ধ হইয়াছেন? সিদ্ধার্থ আপন অন্তরের মধ্যে

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, যশোধরার প্রতি তাঁহার প্রেম কত গভীর। তারপর সেই নবজাত শিশু, পুষ্পস্তবকের মত যে শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের মত যাহার হাসি হৃদয়কে শীতল করে, সেই আনন্দ-পুত্তলী শিশুকে দীর্ঘকালের জন্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তিনি কি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন! সিদ্ধার্থের মন বলিল—সত্যকার ভালোবাসা তো মোহ নয়, সে তো আত্মসুখ কামনা করে না: তিনি যাহাদিগকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন, তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই যে তিনি আজ গৃহত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর।

খ্যাতনামা কবি এডুইন আর্ণল্ডের Light of Asia নামক কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে শাক্যসিংহের মহানিষ্ক্রমণের মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পূর্বে যশোধরা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহার স্বপ্নে ভাবী ঘটনারই পূর্ব-গামিনী ছায়াপাত হইয়াছে। সেই স্বপ্নকাহিনী শুনিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন:

'Comfort thee, dear' ! he said, 'if comfort lives
In changeless love ; for though thy dreams may be
Shadows of things to come,
Yet, whatsoever fall to thee and me,
Be sure taat I loved and love Yasodhara.'

প্রিয়তমে, শাশ্বত প্রেমের মধ্যে যদি সান্ত্বনা থাকে, তবে তুমি নিজের মনকে শান্ত কর। তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা ভাবী ঘটনার প্রতিচ্ছবি হইতে পারে, তথাপি, তোমার ও আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, এ বিষয় নিশ্চিত জানিও যে আমি যশোধরাকে ভালবাসিতাম, এখনও বাসি।'

যশোধরা অশ্রুসিক্ত চোখে পুনরায় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিদায়ের মুহূর্তে সুপ্তিমগ্না দয়িতাকে সম্বোধন করিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন—

'I will depart', he spoke, 'the hour is come !
Thy tender lips, dear sleeper, summon me
To that which saves the earth but sunders us.'

'প্রিয়ে, তুমি এখন সুপ্তির ক্রোড়ে লীন, আমার বিদায়ের সময় উপস্থিত, তোমার পেলব ওষ্ঠযুগল আমাকে সেই পথে আহ্বান করিতেছে, যে পথে গেলে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ ঘটিবে, কিন্তু সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে। 'The hour is come !' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

'সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে।'

মহানিষ্ক্রমণের উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন এবং কণ্টক নামক বায়ুগামী অশ্বকে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। বুদ্ধদেবের চরিতসমূহে এই ছন্দক ও কণ্টকের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা, সিদ্ধার্থ যখন নিখিল জগতের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তখন ছন্দক ও ককণ্টই তাঁহার এই নিষ্ক্রমণের সহায় হইয়াছিল। কণ্টক মূক প্রাণী হইয়াও যেন প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। 'এড়ুইন আর্ণল্ডের Light of Asia গ্রন্থে দেখিতে পাই— সিদ্ধার্থ কণ্টককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে আমার প্রিয় কণ্টক, বায়ুর মত বেগগামী ও অগ্নির মত তেজস্বী হও। তোমার প্রভুর কার্য সম্পন্ন কর। আমার এই কার্যে বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে এবং তুমিও ইহার গৌরবের অংশভাক হইবে। শুধু মানবের তরে আমার এই মহানিষ্ক্রমণ নয়। যে সমস্ত মূক প্রাণী আমাদেরই মত দুঃখ ভোগ করে, যাহারা আশাহীন, তাহাদের সবার জন্যই যে আমার এই নিষ্ক্রমণ।'

'Be fire and air, my horse !
To stead thy Lord, so shalt thou share with him
The greatness of this deed which helps the world ;

Therefore ride I, not for men alone,

But for all things which, speechless, share our pain

And have not hope. nor wit to ask for hope.'

কুমার সিদ্ধার্থ রাজ্য, ঐশ্বর্য, বৃদ্ধ পিতা, রূপবতী তরুণী ভার্যা, আনন্দ-পুত্তলী শিশুপুত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া অনির্দেশ্যের পানে যাত্রা করিয়াছেন। কুমারের নিদারুণ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ছন্দকের হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইল, তিনি সিদ্ধার্থকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁহার সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন। সিদ্ধার্থ ব্যথাকাতর ছন্দককে যাহা বলিয়াছিলেন, 'ললিতবিস্তরে' তাহার বর্ণনা আছে। নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যের দশম সর্গেও শাক্যসিংহের 'মহানিষ্ক্রমণ' বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—

'অসার সম্ভোগ-সুখ, অনিত্য অধ্রুব :
চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্তমুষ্টি সম
অসার ; অস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদের মত ;
দুর্ভোগ্য স্বপন-সম, দুস্পৃশ্য সফণা
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল কখন কাম্য বস্তু-উপভোগে—
কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি ;
কোন্ কাম্যবস্তু নাহি করিয়াছি ভোগ—
সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, বীর্য ? কোন্ ভোগ-পুষ্পে
প্রমত্ত মধুপমত করিনি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু ? কই তৃপ্তি কোথা ?
মত্ত তিমির মত সম্ভোগ-সাগরে

কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এত দিন?
কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ পুষ্পে-পুষ্পে
মত্ত মধুকর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া,
আসিনু কি ধরাতলে? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি? নাহি সুখ? মানব জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার?
না ছন্দক!—আছে শান্তি; আছে নিত্য সুখ;
ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়! আছে মুক্তিপথ।
খুঁজিব সে মুক্তিপথ, খুঁজিব নির্বাণ
এই দাবাগ্নির; ধরা করিব শীতল।
উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে,
সোনার পিঞ্জরে তার, সোনার শৃঙ্খলে,
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া।

সিদ্ধার্থের এই উক্তি হইতে তাঁহার হৃদয়ের ছবি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ নিজের নির্বাণ-লাভের জন্য নহে, নিখিল বিশ্বের পরিত্রাণের জন্য। দৃঢ় অবিচল সংকল্পের দ্বারা, অপরিমিত বীর্যের দ্বারা সিদ্ধার্থ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তারপর, তিনি পরম উৎসাহে দাবদগ্ধ মানবকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ভারতের সুপ্তিমগ্ন আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে শুনিয়াছিল অভয়ের বাণী, অশোকের বাণী, সাম্য ও মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার বাণী। তাই সিদ্ধার্থের মহানিষ্ক্রমণ যেন ভারত-আত্মারই আলোকের অভিসারে যাত্রা।

যেদিন সিদ্ধার্থের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, সেদিন তিনি গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

'জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তি-চয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।'

[সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মূল পালি হইতে অনূদিত, দ্রষ্টব্য 'বৌদ্ধধর্ম্ম', পৃঃ ২৫]

নিজে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই, তিনি এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন যে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী। বুদ্ধদেব মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিখিল বিশ্বের বন্দনীয়।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

সংগ্রামী বুদ্ধ

ভগবান তথাগতের পরিনির্বাণের আড়াই হাজার বৎসর পূর্তি-উপলক্ষ্যে আমরা পৃথিবীর অগণিত নরনারীর কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চারণ করি,—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

শাক্যমুনি শুধু করুণা, মৈত্রীভাবনা ও মুদিতার আদর্শই দেশদেশান্তরে প্রচার করেন নাই, তিনি স্থাপন করিয়াছেন অজেয় পৌরুষ ও সুমহান বীর্যের আদর্শ। আমরা যখন বুদ্ধদেবের করুণাঘন মূর্তির ধ্যান করি, তখন আমাদের মনে হয় সেই বিশাল ও উদার হৃদয়ের কথা, যে-হৃদয় নিখিল বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনা নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছিল। আমাদের মস্তক তখন স্বভাবতই মৈত্রী ও করুণার ঘনীভূত বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নত হয়। কিন্তু যে অপরাজেয় পৌরুষ ও অবিচলিত সঙ্কল্পের বলে তিনি বোধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা স্মরণ করি না, অথচ বুদ্ধদেবই বোধ করি পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগুরু যিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষ দৃঢ় প্রযত্ন ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের দ্বারা নির্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারে। ললিতবিস্তরে বলা হইয়াছে,—"মোহকলুষান্ধকারং প্রজ্ঞাদীপেন বিধমথা সর্বম্।" অর্থাৎ প্রজ্ঞারূপ প্রদীপের দ্বারা মোহকলুষরূপ অন্ধকারকে বিতাড়িত করিবে। ইহাই বোধ হয়, বুদ্ধদেবের উপদেশের সারমর্ম। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে দেখিতে পাই, ভগবান বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিতেছেন; "আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও, ধর্মদীপ হও, ধর্মশরণ হও।"

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে, বৃক্ষমূলে সমাসীন সিদ্ধার্থ যখন "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলিয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আমরা তাঁহার অপরাজেয় পৌরুষের পরিচয় পাই। আমাদের এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সিদ্ধার্থের

দেহে ও মনে দুর্জয় শক্তি ছিল। স্বয়ংবর সভায় তিনি যখন যশোধরার কণ্ঠে মৌক্তিক হার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে শারীরিক শক্তিরও পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ ছিল, মনও তেমনই দ্রঢ়িষ্ঠ ছিল। ললিতবিস্তরে "মারের" বা "পাপের" সহিত তাঁহার সংগ্রামের যে কাহিনী আছে, তাহাতে তাঁহার মনের অনমনীয় দৃঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়। মারের প্রতি সিদ্ধার্থের বীরোচিত উক্তি স্মরণ করিলে আমাদের মনও উৎসাহ-উদ্দীপনায় দীপ্যমান হইয়া ওঠে।

"বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্ গ্রাম্যং নো চ জীবিতম্।
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ।
ন শূরো জায়তে সেনাং জিত্বা চৈনাং ন মন্যসে।
শূরস্তু জায়তে সেনাং, লঘু মার, জয়ামি তে॥

অর্থাৎ "ওরে লঘুচিত্ত মার, প্রাণহর মৃত্যু বরং ভাল, কিন্তু গ্রাম্য জীবনকে ধিক্। পরাজিত হইয়া জীবন-ধারণের চেয়ে সংগ্রামে মরণ শ্রেয়স্কর। সংগ্রামে যে সেনাকে জয় করে, সে যথার্থ বীর নয়। যে তোর সেনাকে জয় করে, সেই যথার্থ বীর। আমি তোর সেনাকে নিশ্চয়ই জয় করিব।"

আবার তিনি বলিতেছেন, "তোর সৈন্যদল দেবতা ও মানবের পীড়া জন্মায়। আমি প্রজ্ঞা দ্বারা তোকে দলন করিব। জলে যেমন আমপাত্র (কাঁচা মাটির ভাণ্ড) ভগ্ন হয়, আমি তেমনই তোকে বিদীর্ণ করিব।"

অবশ্য, এই সংগ্রাম বহির্জগতের নয়, অন্তর্জগতের; তথাপি এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই দৃঢ়চেতা বুদ্ধদেবের প্রবল ব্যক্তি-সত্তার বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

বিজ্ঞানী বুদ্ধ

বুদ্ধদেবের উপদেশের আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোথাও দৈবী কৃপা বা মহাপুরুষের অনুগ্রহের কথা বলেন নাই, মানুষকে অন্ধভাবে অপরের মতের অনুবর্তী হইতে বলেন নাই, নরকের ভয় দেখাইয়া

বা স্বর্গ-সুখের আশ্বাস দিয়া মানুষকে 'ভাল ছেলে' করিয়া তুলিতে চাহেন নাই, বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেন নাই, এমন কি, শ্রদ্ধা-হীন বা সংশয়াত্মা লোক যে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, এমন কথাও বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্য-নির্মাতা, সুতরাং আত্মশক্তির দ্বারা দৈবকে পরাভূত কর, বিচার-বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখ এবং অপ্রমত্তভাবে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হও। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈজ্ঞানিক, জীবের দুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি "কার্যকারণ-শৃঙ্খল" আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে এই কার্যকারণ-শৃঙ্খলের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। মনোবিজ্ঞানেও ভগবান বুদ্ধের দান অনস্বীকার্য্য। বিশেষত, পরবর্তী কালের বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ইহারই ফলে, ভারতীয় মনীষা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধ দর্শনের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেও বৌদ্ধ শূন্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, একথা এখনও অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। যাহা হউক, বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহা "এহিপসসিকো ধর্মো" (এস, দেখে যাও); এই ধর্মের সত্য সকলেরই 'প্রত্যক্ষগম্য"।

সাম্যবাদী বুদ্ধ

মানুষ যখন তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডকেই "ধর্ম" বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও নীচ বর্ণের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় ভগবান বুদ্ধ সর্বমানবের কল্যাণের জন্য আশা ও আশ্বাসের বাণী বহন করিয়াছিলেন এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য অমৃতভাণ্ড উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বৈশালী নগরে বুদ্ধদেব গণিকা অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধদেবের উপদেশে তাঁহার জীবনে রূপান্তর ঘটে। অম্বপালীর সুললিত গাথা

"থেরী-গাথা"-য় স্থান পাইয়াছে। ইনি সর্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার মনোরম উদ্যানগৃহ বৌদ্ধ সঙ্ঘকে দান করেন। বুদ্ধদেব শুধু সাম্যবাদই প্রচার করেন নাই, তিনি পৃথিবীর অন্যতম সাম্যসংস্থাপক। তিনি ছিলেন সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই আজিকার দ্বেষ-হিংসা-জর্জর পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছে—

"এসো হে এসো শ্রেয়, এসো হে মৈত্রেয়
ক্রূরতার মূঢ়তার কর হে অবসান।"

বুদ্ধদেব জনসাধারণকে জনগণের ভাষায়ই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাই পালিসাহিত্য অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও করুণার আদর্শের উপর একদিন ধর্মাশোক যে "কল্যাণ-রাষ্ট্রের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তাই বিদেশী পণ্ডিত এইচ. জি. ওয়েলস অশোকের উদ্দেশ্যে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

মধ্যপন্থী বুদ্ধ

বুদ্ধদেব নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, কঠোর তপশ্চরণ বা কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা মানুষ পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ভোগ-বিলাসের পথ যেমন কল্যাণের পথ নয়, তেমনই তপস্যার দ্বারা দেহকে কর্ষণ করাও শ্রেয়োলাভ বা বোধিলাভের উপায় নহে। তাই তিনি উপদেশ দিয়াছেন, সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করিয়া মধ্যপথের অনুসরণ করিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় এই আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা বেশী ভোজন করে, অথবা যাহারা একান্ত অনাহারী, যাহারা অতিমাত্রায় নিদ্রা যায় অথবা যাহারা অতি জাগরণশীল, তাহাদের কেহই যোগযুক্ত হইতে পারে না। মনস্বী অ্যারিস্টটল যে চরিত্র-নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। অ্যারিস্টটল বলেন, যে-কোন বিষয়ে আতিশয্যই পাপ আর মধ্যপন্থাই শ্রেয়ের পন্থা।

অ্যারিস্টটল পাপ ও পুণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ভীরুতাও যেমন নিন্দনীয়, হঠকারিতাও তেমন গর্হিত; কারণ, উভয়ই আতিশয্য। সাহস বা বীরত্ব ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাই ইহা শ্লাঘনীয়। তেমনই আবার একদিকে কার্পণ্য, আর একদিকে অমিতব্যয়িতা, উভয়ই আতিশয্য বলিয়া বর্জনীয়, মিতব্যয় ইহাদের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া একটি প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে গণ্য। ভগবান তথাগত, মনস্বী অ্যারিস্টটল প্রভৃতি যে মাত্রাজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, সেই মাত্রাবোধের উপরেই সৌন্দর্য-বুদ্ধি বা সামঞ্জস্য-বুদ্ধি নির্ভর করে। ভগবান বুদ্ধের মধ্যে যে একটা সহজ সৌন্দর্যবোধ ছিল, তাহার চরিতকারগণ সে-কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে চারিটি আর্যসত্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে দুঃখবাদী মনে করিবার কোন কারণ নাই, আবার 'তিনি ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বিভ্রান্তিকর (?) উক্তি করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাকে "নাস্তিক" মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি এক হিসাবে "জীবনবাদী" ছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষ তাঁহার জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলুক। ভগবান ঈশাও সেই কথাই বলিয়াছেন, যদিও তাঁহার প্রকাশভঙ্গি পৃথক। তিনি বলিয়াছেন—তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তেমনই তোমরাও পরিপূর্ণতা লাভ কর। ভগবান বুদ্ধ পরিপূর্ণতা লাভের যে-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ, যথা (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সঙ্কল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্মান্ত, (৫) সম্যক আজীব বা সাধু বৃত্তি, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি ও (৮) সম্যক সমাধি।

এই অষ্টাঙ্গ মার্গের ব্যাখ্যা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখানে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। ভগবান বুদ্ধ প্রতিদিন স্থির ভাবে আত্মকর্মের পর্যালোচনা করিতেন। আমরা যদি শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে চাই, তবে আমাদেরও দৈনন্দিন জীবনে আত্ম-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিব—আমাদের সঙ্কল্প "সম্যক

সঙ্কল্প” কি না, অর্থাৎ আমরা সঙ্কল্পে স্থির অবিচল কি না; আমাদের বাক্য “সম্যক বাক্য” কি না অর্থাৎ আমরা সর্বদা সত্য ও প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করি কি না; আমাদের জীবিকা বা বৃত্তি “সম্যক আজীব” কি না, অর্থাৎ আমরা সাধুভাবে অর্থোপার্জন করি কি না ইত্যাদি। যদি আমরা স্বার্থান্ধ, সত্যভ্রষ্ট হই, অথবা উদরভরণের জন্য ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করি (যেমন খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, কৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত করা প্রভৃতি), তাহা হইলে ভগবান তথাগতের নামগ্রহণেও আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্কল্প যদি মহৎ হয়, লক্ষ্য যদি উন্নত হয়, তবে আমাদের পদস্খলন হইলেও আবার উঠিয়া দাঁড়াইব এবং আত্মপ্রযত্নের দ্বারা আবার “নিষ্কলুষ” হইব। এ-কথা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ আমাদের বলিয়াছেন।

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় করুণাঘন বুদ্ধের পূজার নির্দেশ দিয়াছেন ও উহার “ফলশ্রুতি” কীর্তন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আমরা একথা স্বীকার করি যে, আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু যাঁহাদিগকে আমরা অবতার বা লোকোত্তর পুরুষ বলি, তাঁহাদের চরিত্র-মাহাত্ম্য অন্ততঃ আংশিক ভাবেও ধারণা করিতে পারি। এইজন্য, যাঁহারা মহাপুরুষ বা অতি-মানব, তাঁহাদের অনুধ্যানে আমাদের চরিত্র নির্মল হয়, আমাদের জীবনে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটিতে থাকে। সুতরাং জৈনগণ যে তীর্থঙ্করদের, বৌদ্ধগণ যে ভগবান তথাগতের এবং ঈশাপন্থিগণ যে ভগবান ঈশার চরিত্রের অনুধ্যান করেন, তাহার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু মহাপুরুষের পূজা যেখানে একটা প্রাণহীন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হয়, সেখানে উহা শুধু নিষ্ফল নয়, অনিষ্টকরও বটে। বুদ্ধজয়ন্তীর পুণ্যতিথিতে আমরা সকলে যেন এই প্রতিজ্ঞা করি যে, প্রতিদিন ভগবান বুদ্ধের পুণ্য জীবনের অনুধ্যান করিয়া এবং তাঁহার স্নিগ্ধ, করুণাঘন অথচ জ্যোতির্ময় মূর্তিকে হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া আমরা আমাদের জীবনের রূপান্তর সাধন করিব এবং “সর্বোত্তম মঙ্গলের” পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইব।

ভগবান তথাগত ও আচার্য হেরাক্লিটস

পৃথিবীতে সত্যজিজ্ঞাসুর সংখ্যা যদি স্বল্প হয়, সত্যদ্রষ্টার সংখ্যা স্বল্পতর। বিজ্ঞানীরা একনিষ্ঠ সাধনার বলে জড় জগতের সত্যসকল আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের এই আবিষ্ক্রিয়ার মূলে আছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, অথচ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর না পাইলে মানুষের যেন কৌতূহল মেটে না। অবশ্য যে সকল মানুষ পশুস্তরে রহিয়াছে, তাহারা দেহের অভাব মিটাইতে পারিলেই সুখী হয়; আবার কাহারও বা লোভ এমনই দুর্দমনীয় যে, তাহারা শুধু সুখের আশায় প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হয়, সত্যকে জানিবার জন্য অন্তরের মধ্যে কোন 'তাগিদ' অনুভব করে না। কিন্তু যাঁহারা জিজ্ঞাসু ও মননশীল, তাঁহারা বুদ্ধির আলোকে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে চান। ইঁহাদের আমরা সাধারণতঃ বলি 'দার্শনিক'। ইঁহারা সত্যের অখণ্ড বা পরিপূর্ণ রূপটি ধরিতে পারেন না, কিন্তু সত্যের খণ্ড রূপটি ইঁহাদের অন্তরে কখনও কখনও প্রতিভাত হয়। আমরা এখানে ভারতীয় দার্শনিকদের কথা বলিতেছি না, 'ফিলজফার' অর্থেই দার্শনিক কথাটির প্রয়োগ করিতেছি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির যেখানে 'প্রবেশ নিষেধ', সেই গভীরতম রাজ্যের সত্যসকলও মানুষ ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করেন। এইরূপ সত্যদর্শী পুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদেরই তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়।

সিদ্ধার্থ যখন সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন জগতের সকল রহস্যই তিনি করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই জগতের আর্ত নরনারী শান্তি-লাভের আশায় তাঁহার চরণচ্ছায়াতলে সমবেত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ যে সময়ে আমাদের দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই গ্রীসদেশেও হেরাক্লিটস (Heraclitus) নামে একজন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই হেরাক্লিটস জগতের রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত বুদ্ধদেবের এবং বিশেষতঃ মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের অনেক বিষয়ে 'মিল' রহিয়াছে। ইহাতেই বোঝা যায়, সত্য কোন বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কোন বিশেষ জাতির 'একচেটিয়া' পদার্থও নহে।

আমরা জড় পদার্থের দুইটি অবস্থা দেখিতে পাই; ইহা কখনও স্থাণু বা স্থিতিশীল, আবার কখনও গতিশীল। আমাদের চোখে স্থিতি ও গতি দুই-ই সমান সত্য। কিন্তু আমাদের যে অনেক সময় দৃষ্টি-বিভ্রমও ঘটে, বিজ্ঞান সে কথা স্বীকার করিয়া লয়। পৃথিবী আমাদের নিকট স্থির বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা গতিশীল, 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি'। দুইটি রেলগাড়ি যদি সমান্তরাল রেখায় সমান বেগে ছুটিতে থাকে, তবে একটি গাড়ির আরোহীরা মনে করিবে, অপরটি স্থির রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিবিভ্রমকে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান এ কথা বলে যে, স্থিতি ও গতি উভয়ই সত্য। জড়বস্তু তাহার জাড্যধর্ম মানিয়া চলে, তাই সে বস্তু যে দেশ অধিকার করিয়া আছে, অনন্ত কাল সেই দেশই অধিকার করিতে চায়, আর কোন বস্তুকে গতিদান করিলে উহা অনন্ত কাল ছুটিতে চায়। স্থিতি ও গতি লইয়া দার্শনিকেরা কিন্তু নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন, স্থিতিটাই সত্য, গতিটা বুদ্ধির বিভ্রম : আবার কেহ বলেন, গতিটাই সত্য, যাহাকে স্থিরতা বলিয়া মনে হয়, সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আচার্য শঙ্কর বলেন, জগৎটাই একটা বিশাল স্বপ্ন বা মায়া, সুতরাং গতি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু আর এই ব্রহ্মের কোন বিকার বা পরিবর্তন নাই। আচার্য শঙ্করেরও বহু পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের কয়েকজন দার্শনিক এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, 'যাহা বিশুদ্ধ সত্তা বা Pure Being, তাহাই অস্তিত্বশীল, ; যাহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা মিথ্যা।' আবার আচার্য শঙ্করের মত এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক জেনোফেনিস পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন (Way of Truth ও Way of Opinion)। কারণ, মানুষ যতই

চুলচেরা বিচারে প্রবৃত্ত হউক না কেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগৎকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। আবার কোন কোন দার্শনিক পৃথিবীরূপিণী চঞ্চলা নদীর আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গভঙ্গের লীলা দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, এই লীলাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ, গ্রীসদেশের মনীষী হেরাক্লিটস ও ফরাসী দেশের মনস্বী বের্গসঁ,—ইঁহারা সকলেই গতি, পরিবর্তন বা পরিণামকেই একমাত্র সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

আমরা বর্তমান নিবন্ধে ভগবান তথাগত ও আচার্য হেরাক্লিটসের চিন্তা-ধারার সাদৃশ্য দেখিতে চেষ্টা করিব। এই সংসারে সকলই ক্ষণিক, সকলই পরিবর্তনশীল—এ কথাটি ভগবান বুদ্ধের পূর্বগামী কোন আচার্য এতটা জোরের সঙ্গে প্রচার করেন নাই। মাধবাচার্য বৌদ্ধদর্শনের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

(১) পৃথিবীতে সকলই ক্ষণিক অর্থাৎ নিত্য বস্তু বলিয়া কিছু নাই। (২) সকলই দুঃখময়, সংসারে মানুষ যাহাকে সুখ মনে করে, তাহা দুঃখেরই অভাব মাত্র। অবশ্য, ইহাকে দুঃখবাদ বা Pessimism বলা যায় না। কেন না, ভগবান বুদ্ধের মতে দুঃখ ও দুঃখের কারণ যেমন সত্য, দুঃখের নিবৃত্তিও তেমনই সত্য। সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায়ও আছে, আর তিনি জগতের নরনারীকে সেই উপায়েরই সন্ধান দিয়াছেন। (৩) সকলই স্বলক্ষণ, সামান্য বা Universal নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। (৪) সকলই শূন্য, বাহ্য বস্তুই হউক আর বিজ্ঞানই হউক, কোন কিছুরই বাস্তব সত্তা নাই। এ কথা অবশ্য সত্য যে, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বুদ্ধের বাণীর মধ্যেই এই কয়েকটি মূল সূত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, নিখিল বিশ্ব কার্যকারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত, তাই সংসারে এমন কোন কর্ম নাই যাহা ইহকালে বা মৃত্যুর পর ফল প্রসব করে না। অথচ তিনি কোন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি মৌনালম্বন করিতেন অথবা এমন উত্তর দিতেন যাহাতে প্রশ্নকর্তা বিভ্রান্ত হইতেন। মিলিন্দ

প্রশ্নে দেখিতে পাই, বৌদ্ধাচার্য নাগসেন যবনরাজ মিলিন্দের নিকট নামরূপের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নিশীথের দীপশিখা ও শেষ প্রহরের দীপশিখা ভিন্নও বটে আবার অভিন্নও বটে, তেমনই যে জীব কর্ম করে এবং যে জীব মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ করে, ইহারা একও বটে, আবার ভিন্নও বটে। বৌদ্ধদর্শনে কি ভাবে অনাত্মবাদের সঙ্গে কর্মফলবাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে, সে জটিল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিব না, আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, ভগবান বুদ্ধের নিকট গতি যেমন সত্য, নির্বাণও তেমনই সত্য, আর এই নির্বাণে আছে সকল বাসনার বিপুল বিরতি। তাঁহার নিকট সিন্ধুর শান্ত অনুত্তরঙ্গ বিক্ষোভহীন অবস্থা যেমন সত্য, অশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গের লীলাও তেমনই সত্য। অবশ্য, সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াও যে মানুষ শুধু লোকহিতের জন্য কর্ম করিতে পারে, লোকোত্তর পুরুষ 'বুদ্ধদেব' তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানুষ দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া অকারণে শক্তির অপচয় করে, অথচ যথার্থ কল্যাণের পথে সে অগ্রসর হয় না। তাই তিনি আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যিনি কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাকে মনের মিতব্যয় শিক্ষা করিতে হইবে। ধনের মিতব্যয় গৃহস্থমাত্রেরই শিক্ষণীয়, যিনি মিতব্যয়ী, তিনি প্রতিদিন ধনসঞ্চয় করেন, কারণ তিনি জানেন, 'কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ', তাই তিনি দুর্গতির দিনেও বেশী মাত্রায় অবসন্ন হন না। তেমনই 'মনের মিতব্যয়' যিনি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার করেন না, তিনি প্রতিদিন পুণ্য সঞ্চয় করেন, প্রতিদিন চারিটি ধর্ম-চেষ্টা করেন, সুতরাং তিনি কখনও অবসন্ন বা মুহ্যমান হন না। তিনি অর্জিত পুণ্যকে সযত্নে রক্ষা করেন, অলব্ধ পুণ্যের অর্জন করেন, পূর্বসঞ্চিত পাপ সযত্নে পরিহার করেন এবং নূতন পাপের যাহাতে উৎপত্তি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আমরা জানি, গতিই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু। বুদ্ধদেব উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন শুধু গতিশীল নয়, আমরা ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছি। যে অশুভ কর্ম করে সেও নিজেকে সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সে সৃষ্টি শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়। যিনি জীবন-শিল্পী, তিনি শুভকর্মের দ্বারা প্রতিদিন নিজেকে সুন্দরতর, উন্নততর, মহত্তর করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, তিনি শুধু সেই কর্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন যাহাতে আপনার ও সর্বভূতের হিত হয়। মানুষের জীবন একটা অবিশ্রাম চলার প্রবাহ, কিন্তু সে সম্মুখে অগ্রসর হইবে, না, পশ্চাদ্গামী হইবে, তাহা একমাত্র তাহার কর্মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধই প্রথমে সৃষ্টিধর্মী পরিণামবাদ বা Theory of Creative Evolution স্থাপন করিয়াছিলেন।

এবার আমরা দার্শনিক হেরাক্লিটসের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিব। হেরাক্লিটসের মতে নিত্যবস্তু বলিয়া কিছু নাই, সকলই নদীর মত গতিশীল। নদীর লহরী যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে, তেমনই সংসারের প্রত্যেক বস্তুই প্রতি মুহূর্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। কালকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্তনের এই অশ্রান্ত লীলা চলিয়াছে। সুতরাং একই নদীতে দুইবার অবতীর্ণ হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য, কেন না, এক মুহূর্ত পূর্বে যে নদী বিদ্যমান ছিল, সে নদী আর নাই। সংসারে কিছুই স্থির নয়, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কেও বিশ্বাস করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাও মিথ্যা জ্ঞান। পৃথিবীতে গতিই সত্য, কারণ, এখানে চলিতেছে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব। যেখানে উৎপত্তি আছে সেখানেই আছে ধ্বংস, আবার যেখানে ধ্বংস আছে, সেখানেই আছে সৃষ্টি। জীবনের মধ্যে আছে মৃত্যুর খেলা, আবার মৃত্যুর মধ্যে আছে নবজীবনের সম্ভাবনা। যেখানে ঐক্য, সেখানেই বৈচিত্র্য, যেখানে সামঞ্জস্য, সেখানেই অসঙ্গতি. যেখানে আকর্ষণ, সেখানেই বিকর্ষণ; ইহাদের একটির অভাবে অপরটি শূন্য মাত্র।

হেরাক্লিটস বলেন, সকল পদার্থের মূলে রহিয়াছে অগ্নি। এই যে অগ্নির কথা হেরাক্লিটস বলিয়াছেন, ইহা সম্ভবতঃ গতির প্রতীক। আমাদের জীবনে

প্রতি মুহূর্তে যে পরিবর্তন চলিয়াছে, সেই পরিবর্তন অগ্নিরই ধর্ম। আমাদের জীবনে উত্তাপ, উৎসাহ, উদ্দীপনা সকলেরই মূলে রহিয়াছে অগ্নি। অগ্নির মধ্যে হেরাক্লিটস সৃষ্টিরহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিগণও অগ্নিদেবতার উদ্দেশে বহু সূক্ত রচনা করিয়াছেন। এইজন্য পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হেরাক্লিটসকে বলিয়াছেন, 'বেদমন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য'।

ভগবান তথাগত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সত্যের পরিপূর্ণ রূপ, আর হেরাক্লিটস দর্শন করিয়াছেন সত্যের খণ্ডিত রূপ। ভগবান তথাগত প্রত্যেক বস্তুর ক্ষণিকত্ব ও জীবনের গতিশীলতা স্বীকার করিলেও গতিকে চরম সত্য বলিয়া প্রচার করেন নাই। তিনি মানুষের ক্রমিক রূপান্তরের আদর্শই শুধু প্রচার করেন নাই, জীবনের সেই চরম লক্ষ্যের কথাও বলিয়াছেন, যেখানে সকল চাঞ্চল্যের, সকল গতির অবসান হয়। সে অবস্থায় শুধু লোকহিতের জন্যই কর্ম করা চলে। অবশ্য, পরবর্তী কালে মহাযান দার্শনিকদের মধ্যে কেহ শূন্যবাদ, কেহ বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতেই ভগবান তথাগতের জীবনদর্শনের কয়েকটি মূল সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা অসাধারণ মনীষী হইলেও ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক মনে করিবার কোন কারণ নাই। বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের মূল কথা এই, জীব কর্মবশে জন্ম-জন্মান্তরের পথে পরিভ্রমণ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু আবার কর্মের দ্বারাই সে তাহার এই পরিক্রমার অবসান ঘটাইতে পারে। এই অবসান ঘটাইবার উপায় হইতেছে অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গের অনুসরণ। আর যিনি সর্বদা উৎসাহের অগ্নিকে অন্তরে প্রদীপ্ত রাখিতে পারেন, একমাত্র তিনিই এই পথের যাত্রী হইতে পারেন।

অগ্নি-উপাসক পারসিকগণের শাস্ত্রে অগ্নি চিদানন্দময় ব্রহ্মের (অহুরা মজ্দার) প্রতীক। আমাদের শাস্ত্রেও জ্ঞানকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, যথা ভগবদ্গীতায় 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'। অবশ্য, যাহা কিছু আলো দেয় তাহাকে যেমন অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়,

তেমনই যাহা কিছু দগ্ধ করে তাহাও অগ্নির সঙ্গে উপমিত হয়, যেমন আমরা বলিয়া থাকি কামানল, ক্রোধানল ইত্যাদি। ভগবান তথাগত যখন আনন্দকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মদীপ হইয়া বিহার কর,' তখন তিনি মানুষকে প্রজ্ঞার আলোকে চলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাইবেলে দেখিতে পাই, জন্ দি ব্যাপটিস্ট দীক্ষার্থীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me···shall baptize you with Holy Ghost and with fire'—'আমি অনুতপ্ত ব্যক্তিদিগকে জলাভিষেক দ্বারা দীক্ষিত করি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসিতেছেন···তিনি তোমাদিগকে শুদ্ধ আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন।'

এখানে জনের কথার তাৎপর্য এই যে, প্রভু ঈশা (Jesus) সকলের অন্তরকে অধ্যাত্ম-ভাবধারায় সঞ্জীবিত ও উৎসাহের অগ্নিতে দীপ্যমান করিয়া তুলিবেন। আচার্য কেশবচন্দ্র 'জীবনবেদ' নামক গ্রন্থে যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা বলিয়াছেন, সে এই তেজ-বীর্য-উৎসাহ-উদ্দীপনার অগ্নি। যাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখা। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের অর্থও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, কারণ, ইহা বলিষ্ঠ পৌরুষের ধর্ম, ইহাতে দৈবকৃপার কোন স্থান নাই।

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বলিতেছেন—'অধ্যাত্ম পক্ষে অন্তঃকরণে অগ্নি-প্রেরণা সর্বদা প্রজ্বলিত না রাখিতে পারিলে দিব্য জীবন সম্ভব হয় না। ইহাই তো পরম অভীষ্ট। অন্তর-প্রেরণা কি অনুষ্ঠান পক্ষে, কি অধ্যাত্ম পক্ষে চিরজাগ্রত রাখিতে হইলে অগ্নির তুল্য অন্য কি উপমেয় থাকিতে পারে? তাই অধ্যাত্ম জীবনের ক্ষেত্রপতি অগ্নি। গৃহস্থের পক্ষেও অগ্নিই অভীষ্টপ্রদ।' ('প্রবর্তক,' বৈশাখ ১৩৬৩)

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূলে রহিয়াছে অগ্নি বা গতিশীলতা, অগ্নি বা উত্তাপই জীবনের ধর্ম,জীবজগতে যে বিরামবিহীন প্রাণচাঞ্চল্য দেখিতে পাই, উহারও মূলে রহিয়াছে অগ্নিরই প্রেরণা, এই সত্য ভগবান তথাগত ও আচার্য

হেরাক্লিটস বিভিন্ন ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ জীবনের প্রবাহ বুঝাইবার জন্য দীপশিখার উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেরাক্লিটসের উপদেশ এই : হে মানুষ, ইন্দ্রিয়ের অধীন হইও না, অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িও না। আপনধীশক্তির আলোকে পথ চল। ভগবান বুদ্ধও এই কথাগুলি কত ভাবে কত পরিচিত উপমার সাহায্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সবচেয়ে বড় উপদেশ এই যে, সমস্ত পাপ ও পুণ্যের মূল রহিয়াছে মনে, কারণ মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী। আমরা অধ্যাত্মশাস্ত্রে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, যথা—'বদ্ধাভিমানী বদ্ধঃ স্যাৎ মুক্তো মুক্তাভিমান্যপি' অথবা 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ' ইত্যাদি।

আমরা ভগবান তথাগত ও আচার্য হেরাক্লিটসের জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব, সত্য কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে, মানুষ যেমন দুরূহ সাধনার বলে সত্যের অখণ্ড রূপটি দেখিতে পায়, তেমনই গভীর চিন্তার ফলেও সে সত্যের আভাস পাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ভগবান তথাগতের ন্যায় সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, শুধু তাঁহারাই পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারেন এবং মানুষকে প্রেয়ের পথ হইতে শ্রেয়ের পথে আকর্ষণ করিতে পারেন; আর যাঁহারা হেরাক্লিটসের মত দার্শনিক, তাঁহারা মানুষের চিন্তার রাজ্যে একটা আলোড়ন উপস্থিত করিতে পারেন এবং মননশীল মনুষ্যকে নিজ নিজ প্রজ্ঞার আলোকে সকল জিজ্ঞাসার সমাধানে আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে পারেন।

ভারতীয় দৃষ্টিতে আইনষ্টাইনের জীবনদর্শন

আইনস্টাইনের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। তিনি মানুষের চিন্তা-জগতে যে অভাবনীয় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল কতখানি সুদূরপ্রসারী হইবে, সে সম্পর্কে কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারি।

কিন্তু আইনস্টাইন শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নহেন, তিনি পৃথিবীর অন্যতম মনস্বী হিসাবেও চিরকাল আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারায় দুইজন মনীষীর প্রভাব অনস্বীকার্য—স্পিনোজা ও সোপেনহাওয়ার। স্পিনোজার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট, আবার সোপেনহাওয়ারের 'মতবাদে' উপনিষদ্‌সমূহ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর ও জগৎ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণাও যে অনেকটা আচার্য শঙ্করের অনুগামী, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন 'শনিবারের চিঠি'র বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৬২) 'আইনস্টাইনের জীবনদর্শন' বিবৃত করিয়াছেন। জীবন, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণা কিরূপ ছিল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা জানা যায়। মহামনস্বী আইনস্টাইনের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য ও তাঁহার প্রকাশভঙ্গির সুস্পষ্টতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে কি না সন্দেহ। আমি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে 'আইনস্টাইনের জীবনদর্শন' আলোচনা করিব এবং প্রয়োজনমত শ্রীযুক্ত সেনের প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব।

* * *

প্রতীচ্য মনীষীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের ধর্মবোধের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—ভয় হইতেই

মানুষের মনে প্রথম ধর্মবুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। যাঁহারা সেমেটিক ধর্মসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক। মহামনস্বী আইনস্টাইনের মত 'কুশাগ্রীয়ধী' ব্যক্তিও এইরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ধর্মমত ও ধর্মের অভিজ্ঞতা বিবিধ পরিবর্তনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুধার, হিংস্র জীবজন্তুর, নানাপ্রকার ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়—হইতেই আদিম মানবের ধর্মমতের উৎপত্তি।"

পৃথিবীতে সকল ধর্মের উৎপত্তি যে একই ভাবে হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পৃথিবীর বহু মনীষী নানা ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বিরোধও বড় অল্প নয়। জীবন, জগৎ ও জগৎকর্তা সম্পর্কে ইহুদীগণের যে ধারণা ছিল, আর্যজাতির ধারণা তাহা হইতে স্বতন্ত্র; আবার ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় আর্যের চিন্তাধারায় যে পার্থক্য রহিয়াছে, বেদ ও জেন্দ্-আবেস্তার তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতা। এই ঋগ্বেদ-সংহিতায় আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত যে সমস্ত 'ঋকে'র বা 'সূক্তে'র সন্ধান পাই, তাহাতে বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ আর্যমনের বিস্ময়ের প্রকাশ আছে, আনন্দের প্রকাশও আছে, জীবনের ও যৌবনের জয়গান আছে, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা বা তত্ত্বদৃষ্টিও আছে, আবার অপূর্ব কবিত্ব-শক্তিরও নিদর্শন আছে, কিন্তু কোথাও নৈরাশ্য বা ভয়ের সুর ধ্বনিত হয় নাই। পরবর্তী কালে যাঁহাকে উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয় বলা হইয়াছে, যাঁহার সম্পর্কে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ যমশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

মহানির্বাণতন্ত্র যাঁহাকে বলিয়াছেন 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,' সেই রুদ্র দেবতাকে ঋগ্বেদ-সংহিতার কোথাও দেখা যায় না। ঋগ্বেদ-সংহিতা যদি আমাদের প্রাচীতম ধর্মগ্রন্থ হয়, তবে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, ভয় হইতেই আর্যজাতির মনে ধর্ম-বোধ জন্মলাভ করিয়াছে।

আইনস্টাইন যে ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সে ধর্ম অবশ্য প্রচলিত ইহুদীধর্ম বা খ্রীষ্টধর্ম হইতে স্বতন্ত্র। নিখিল জগতের নিয়ন্তা ও শাস্তা কোন জগদীশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। ভারতীয় দর্শনে যাঁহাকে সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর বলা হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাঁহাকে Personal God বলে, তিনি সেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানিয়া লন নাই। জগৎ যে কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত অথচ মানুষের মন ও বুদ্ধি জগতের রহস্য ভেদ করিতে পারে না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে জগতের রহস্যবোধ এক দিকে শিল্প ও বিজ্ঞানের ও অপর দিকে যথার্থ ধর্মের উৎস। তাই যথার্থ ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ নাই। তবে এরূপ যথার্থ ধর্মের অনুভূতি পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই লাভ করিতে পারেন। প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী, ইহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা যায় না।

এখানে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। আইনস্টাইন সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আচার্য শঙ্করের মতেও ঈশ্বর 'মায়োপহিত চৈতন্য'। উপনিষদ্ যে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন—

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে, অথবা—

'অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।'

তিনি আছেন—শুধু এইটুকু বলা ভিন্ন কিরূপে তাঁহাক উপলব্ধি করা যায়?

—সে ব্রহ্মকে মানিতে আইনস্টাইনের কোন আপত্তি নহে। কারণ, আইনস্টাইনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেই সত্তার কথাই বলিয়াছেন, মানুষের বুদ্ধি যাহার রহস্য ভেদ করিতে পারে না। অবশ্য, শঙ্করের মতবাদের সঙ্গে আইনস্টাইনের মতের বিভিন্নতাও কম নয়। শঙ্কর যে যুক্তির বলে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন অথবা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত আইনস্টাইনের চিন্তাধারার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু স্পিনোজার Substance, আচার্য শঙ্করের ব্রহ্ম ও আইনস্টাইনের রহস্যময় সত্তা—হয়তো স্বরূপত অভিন্ন।

বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন, "বৈজ্ঞানিক সমগ্র জগতে নিয়মের লীলা দর্শন করেন ; তিনি বিশ্বাস করেন যে, জগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ; কোন সত্তা যে নিজশক্তি দ্বারা ঘটনা-পরম্পরাকে···পরিবর্তন করিতে পারে—বৈজ্ঞানিক এরূপ ধারণাই করিতে পারেন না ; ভগবান পাপ-পুণ্য অনুসারে মানুষকে পুরস্কৃত করেন, অথবা শাস্তি দেন—এ ধারণা তাঁহার পক্ষে অভাবনীয় ।"

আইনস্টাইন সেমেটিক ধর্মের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। এই সেমেটিক ধর্মের ত্রিধারা ইহুদী ধর্ম, ঈশাহী ধর্ম ও ইশ্লাম ধর্ম। এই সকল ধর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা চলে কি না বলা কঠিন, কিন্তু ভগবানকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া শুধু কার্যকারণের ভিত্তির উপরও যে ধর্মের সৌধ নির্মাণ করা যায়, একমাত্র ভারতবর্ষই তাহা দেখাইয়াছে। আমরা এখানে বৌদ্ধধর্মের কথা বলিতেছি। আবার শঙ্করাচার্য যে 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন, উহা শুধু দার্শনিক মতমাত্র নহে ; উহা একটি বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি, আর এ সাধনার ধারা এখনও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়কে যদি আমরা একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বলিয়া মনে করি তবে আমরা বলিতে পারি, ইহাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গেও বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই।

সেমেটিক ধর্মে ধর্মচর্যার মূল প্রেরণা—দেহান্তে চিরন্তন স্বর্গ-প্রাপ্তির লোভ। আইনস্টাইনের মতে ধর্ম মানুষকে পরকালে নরকের ভয় অথবা স্বর্গের লোভ দেখাইয়া মানুষ-হিসাবে তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইলে মহামনস্বী আইনস্টাইন দেখিতেন, ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা থাকিলেও ঋষিগণ স্বর্গের লোভ দেখাইয়া মানুষকে ধর্মে প্রবৃত্ত করিতে চাহেন নাই। ভারতবর্ষে এবং একমাত্র ভারতেই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের ঋষিগণ এই অদ্ভুত কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন যে, পাপের ন্যায় পুণ্যও বন্ধনমাত্র, যেমন লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় স্বর্ণশৃঙ্খলও শৃঙ্খলমাত্র। বেদান্তে বলা হইয়াছে—যিনি

ইহলোকে ভোগসুখের কামনা ও পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা হইতে মুক্ত, তিনিই বেদান্ত পাঠের অধিকারী।

আইনস্টাইনের ন্যায় লোকোত্তর পুরুষ যদি ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্পিনোজা ও সোপেনহাওয়ারের মত ভারতীয় চিন্তার দ্বারাও প্রভাবিত হইতেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার ধারণার পরিবর্তন ঘটিত এবং তিনি যাহাকে 'যথার্থ ধর্ম' বলিয়া মনে করেন তাহার উদ্ভবও যে ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছিল, এই সত্য আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। আইনস্টাইনের উদ্দেশে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিব—অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যদি ভারত-আত্মার বাণীর সঙ্গে পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনদর্শনের দ্বারা পৃথিবী অধিকতর লাভবান হইতে পারিত।

শৈব দর্শনের ভূমিকা

ভারতীয় হিন্দুর ধর্মসাধনার তিনটি প্রধান ধারা—শৈব সাধনা, শক্তি-সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনা। সত্যকার ভারতবর্ষকে জানতে হ'লে এই ত্রিবেণীর পুণ্যধারায় অবগাহন ক'রে ধন্য হ'তে হয়। এই যে ত্রিধারার কথা বললাম, এ হ'চ্ছে প্রধানত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সাধনার ধারা।

ভারতীয় সভ্যতায় আর্য ও প্রাগ্-আর্য সংস্কৃতির ধারা কেমন করে' গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মতো অবিরোধে মিলিত হ'য়েছে, মহেশ্বরের পরিকল্পনার ক্রমবিকাশের ভিতর তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এদেশের সভ্যতা হ'চ্ছে একটি বিশাল সাগরের মতো, এতে ঋজুগামিনী ও বক্রগামিনী নানা নদীর জলধারা এসে মিলিত হয়েছে। ভারতবর্ষ বিচিত্র ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে' তাকে নতুন রূপদান ক'রেছে, তাই সে মহাভারতের মর্যাদা লাভ করেছে। ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভিতরেও এই স্বাঙ্গীকরণ বা আত্মসাৎ-করণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যগণ প্রাগ্-আর্য সভ্যতাকে বিনাশ ক'রেন নি, কুক্ষিগত করেছেন আর তারই ফলে এক মহত্তর ও উন্নততর সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। আমরা যে দেবাদিদেব মহেশ্বরের উপাসনা করি, তার পরিকল্পনায়ও সম্ভবত প্রাগ্-আর্য, আর্য ও বৌদ্ধ সভ্যতার এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। তারপর কালক্রমে বহু সাধক শিবের উপাসনাকে মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুর মতো শিবকে অবলম্বন করেও নানা স্তোত্র রচিত হয়েছে, আর সাধকগণ এই উপাসনাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে শৈব দর্শনের সৃষ্টি করেছেন।

উপনিষদের ঋষিগণের দৃষ্টিতে যিনি পরব্রহ্ম, তিনি একদিকে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, অপরদিকে রুদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর। কিন্তু বেদে বা উপনিষদে কোথাও মহেশ্বরের পরিকল্পনা নেই। রামায়ণ বা মহাভারতের যুগে কিন্তু শিব স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের এই দু'খানি জাতীয় মহাকাব্যে

আমরা শিবের সম্পর্কে নানা কাহিনীর উল্লেখ দেখতে পাই। পুরাণে শিব প্রলয়ের দেবতা ব'লে কথিত হয়েছেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পার্শ্বে আপন স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু একই পরব্রহ্মের ভিতরেই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তি নিহিত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে যে একই পরব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, একথা নানা পুরাণে একাধিকবার কথিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আমাদের উপাস্য দেবতা মহেশ্বরকে আমরা যোগীশ্বরে পরিণত করেছি—ভস্ম ও চন্দনে, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে তাঁর দৃষ্টিতে কোনো ভেদ নেই, তিনি পরম জ্ঞানী, তাঁর ললাটে সর্বদা প্রজ্ঞা-চক্ষু দেদীপ্যমান, তাঁর ললাটস্থ বহ্নি কামদেবকে ভস্মে পরিণত করেছে, সমুদ্র-মন্থনকালে দেবতাগণ যখন অমৃতপানে অমর হ'য়ে নানা সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, তখন তিনি হলাহল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। আবার তিনি আমাদের দৃষ্টিতে আশুতোষ। শিবরাত্রির ব্রতকথায় দেখতে পাই, সামান্য বিল্বপত্রে তুষ্ট হ'য়ে তিনি হীন ব্যাধকে শিবলোক প্রদান করেছেন। তিনি ভক্তগণের প্রতি বরদ, অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে এবং তাঁর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় লাভ ক'রে তিনি তাঁকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। তাঁর জটায় ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা, ললাটদেশে চন্দ্রকলা, গলদেশে লম্বিতা ভুজঙ্গমালা, ডমরুধ্বনির তালে তালে যখন তিনি তাণ্ডব নৃত্য করেন, তখন ভুজঙ্গমের নিশ্বাসে তাঁর ললাটস্থ অগ্নি অধিকতর প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে, তাঁর কণ্ঠে প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের নীলিমা, আলো যেমন ছায়ার সঙ্গে সংলগ্ন, তেমনি তিনি পার্বতীর অঙ্গে সংলগ্ন হ'য়ে রয়েছেন, ভক্তগণের দিব্যদৃষ্টিতে তিনি অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। মহাকবির উপযুক্ত এই যে বিরাট কল্পনা, এতে আমাদের চিত্তসমুন্নতি ঘটায়, সন্দেহ নেই। ধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনার দ্বারা মহেশ্বরের মূর্তি-কল্পনা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা, সে বিচারের ভার পণ্ডিতদের উপর; কিন্তু মহেশ্বরের মূর্তিচিন্তন ও তাঁর গুণাবলীর অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে সত্যই আমাদের ভব-বন্ধন ছিন্ন হ'তে পারে এবং আমরা রূপান্তর লাভ করতে পারি।

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্বতীর যে অলোক-সামান্য

চরিত্র চিত্রিত করেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা আছে বলে মনে হয় না। রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি বাক্ ও অর্থের মতো সম্পৃক্ত জগৎপিতা মহেশ্বর ও জগন্মাতা পার্বতীর বন্দনা করেছেন। এই সমস্ত কারণে অনেক পণ্ডিত এরকমের মত পোষণ করেছেন যে, মহাকবি ধর্মসাধনায় শৈব ছিলেন। আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যিনি শ্রেষ্ঠ মহাজনের মর্যাদা লাভ করেছেন, সেই কবিকুলচূড়ামণি বিদ্যাপতিও যে শৈব ছিলেন, সে বিষয়ের কিছু নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্রের বহু পূর্বে তিনি একথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে, হরি ও হরের ভিতর কোন পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষের আরও অনেক কবি, আলঙ্কারিক ও দার্শনিক যে শিবের উপাসক ছিলেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

মহেশ্বরের অলৌকিক চরিত্র এ যুগের দুজন বিশ্ব-বরেণ্য বাঙালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের একজন হচ্ছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আর একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'হে ভারত, ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'। আমাদের মহাকাব্যে ও পুরাণে বর্ণিত হর-পার্বতীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তার নজির উদ্ধৃত করতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হয়।

বাংলা দেশে শিব কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ। এই জন্যে এ দেশের কুমারীগণ শিবের মতো বর প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবার শূন্য পুরাণে সংকলিত ছড়ায় শিবের কৃষকরূপ কল্পিত হয়েছে। বাংলার লৌকিক শিব পৌরাণিক শিব থেকে স্বতন্ত্র, এতে বাঙালীর নিজস্ব ভাব-কল্পনা রয়েছে, আবার নানা সংস্কৃতির প্রভাবও রয়েছে।

শৈবধর্ম নাথধর্মের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। মীননাথ মহাদেবকে গুরু ব'লে স্বীকার করেছেন। ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে শিব তত্ত্বদর্শী, তিনি জন্মান্ধ হ'য়েও ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে ত্রিলোচন হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সব লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের কোন সম্পর্ক নেই। শিবের গাজন,

ধর্মের গাজন প্রভৃতি লৌকিক উৎসব,—এইসব উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলা দেশে প্রচলিত শিবের ছড়ায় শিবকে মহিমান্বিত করা হয়নি, কিন্তু বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা দেশে যেসব শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে, তাতে শুধু লৌকিক কাহিনী নয়, পৌরাণিক কাহিনীও গৃহীত হয়েছে। শিবায়ন কাব্যগুলোর ভিতর রামেশ্বর চক্রবর্তীর গ্রন্থখানাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার লৌকিক ধর্মে ও বাংলা সাহিত্যে শিবের লোকোত্তর মহিমা অনেকটা ম্লান হয়েছিল। পরবর্তীকালে রচিত দু' একখানি পুরাণেও তাঁর লোকোত্তর চরিত্রকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে শৈব সম্প্রদায়ের ভিতর যেসব সাধক ও সিদ্ধ-পুরুষ জন্মেছেন, তাঁদের চিত্তে মহাদেবের প্রশান্ত, অচঞ্চল, সমাহিত মূর্তি চিরদিন অম্লান জ্যোতিতে দীপ্যমান রয়েছে।

২

এবার আমরা শৈব দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

শৈব দর্শন 'সেশ্বর' সাংখ্য দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য দর্শন হচ্ছে দ্বৈতবাদী, এতে দুটি পৃথক তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে—অচেতন অথচ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি আর সচেতন অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষ। পুরুষ হচ্ছেন উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ। অথচ পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না। পুরুষ পঙ্গু আর প্রকৃতি অন্ধ। পঙ্গু ও অন্ধের মিলন হ'লেই তারা পরস্পরের সহযোগিতায় গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে। শৈব দর্শনের মতে কিন্তু সত্তা হচ্ছে তিনটি—শিব বা ঈশ্বর, পুরুষ ও জড়জগৎ। পুরুষ যতদিন পাশে বদ্ধ, ততদিন তাকে বলা যায় পশু, তাই পুরুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কটা হচ্ছে ঠিক পশু ও তার প্রভুর মতো, আর জড়জগৎ পুরুষের বন্ধনেব কারণ ব'লে পুরুষের সঙ্গে জড়-জগতের সম্বন্ধটা হচ্ছে পশু ও তার বন্ধন-রজ্জুর মতো।

অতএব শৈব দর্শনের মতে পদার্থ হচ্ছে তিনটি,—পতি বা ঈশ্বর, পশু বা জীব আর পাশ বা সংসার-বন্ধন। পশুদিগের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই, আবার

পাশ বা সংসার-বন্ধনের কোনও চৈতন্য নেই কিন্তু ঈশ্বরে যেমন স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তেমনই আবার চৈতন্যও রয়েছে। পশুদের চৈতন্য আছে বটে কিন্তু নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নেই। পুরুষার্থ যিনি লাভ করতে চান, তাঁকে ঈশ্বর, পশু ও পাশ এই তিনটি পদার্থেরই স্বরূপ জানতে হবে। একমাত্র ঈশ্বরই জীবকে পাশ থেকে মুক্ত করতে পারেন। তবে যার যেমন অধিকার, ঈশ্বর তাকে তেমন ফলই দান করে থাকেন। পশুকে কিন্তু সাধনার দ্বারাই ধীরে ধীরে পাশমুক্ত হ'তে হয়। আর এই পাশমোচনে তাকে সাহায্য করে বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্যা। বিদ্যা মানে অবশ্য পুঁথিগত বিদ্যা নয়। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেই আমাদের যথার্থ বিদ্যার আরম্ভ হয়। ক্রিয়া হচ্ছে গুরুর উপদেশ অনুসারে কাজ করা। যোগ হচ্ছে পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আর চর্যা হচ্ছে আচরণ অর্থাৎ যে কর্মের বিধান রয়েছে, তার অনুষ্ঠান করা আর যা নিষিদ্ধ হয়েছে তাকে বর্জন করা।

ঈশ্বর যে জগতের সৃষ্টিকর্তা, তা আমরা অনুমানের দ্বারা বুঝতে পারি। এই জগতের প্রকৃতি চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, জড় পরমাণুর সংযোগের ফলে এর উৎপত্তি হ'তে পারে না। যিনি জগৎ রচনা করেছেন, তিনি অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। যাঁরা মুক্ত পুরুষ, তাঁরাও কিন্তু ঈশ্বরের সমান নন। কেননা, ঈশ্বর হচ্ছেন স্বতন্ত্র, কিন্তু মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরের অধীন বলে পরতন্ত্র। নকুলীশ পাশুপত দর্শনে কিন্তু বলা হয়েছে যে, মুক্ত পুরুষেরা কারও অধীন নন, তাঁরা ঈশ্বরের মতই স্বতন্ত্র।

ঈশ্বর যেমন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনই জীবের দেহও সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ, তারই ধ্বংস আছে। জীবদেহের ধ্বংস আছে, এটা হচ্ছে একটা নশ্বর পদার্থ, কাজেই এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, একথা মানতেই হবে। তা ছাড়া, জীবদেহে কত কলা-কৌশলের, কত সৃষ্টিনৈপুণের পরিচয় রয়েছে, তাই দেহ যিনি গড়েছেন, তিনি যে একজন নিপুণ শিল্পী, তা'তে সন্দেহ নেই। ঈশ্বর জীবকে কর্মফল অনুসারেই সুখ ও দুঃখ দান করেন। কিন্তু তবু এতে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার কোনও হানি হয় না।

বলা হয়েছে, এই জগতের যে একজন বুদ্ধিমান কর্তা আছেন, তা' অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই কর্তা বা ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তাঁর দেহ নেই বা ইন্দ্রিয় নেই, তবু তিনি কার্য করেন, যেমন জীবাত্মা অশরীরী কিন্তু ইচ্ছামত উহা মানুষের দেহকে স্পন্দিত করতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঈশ্বরের দেহ আছে বটে, কিন্তু রাম শ্যামের মতো প্রাকৃত দেহ নেই। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনি মুক্ত পুরুষ, তাই কোনও পাশই তাঁকে বদ্ধ করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের কখনও প্রাকৃত শরীর থাকতে পারে না।

ঈশ্বরের শক্তিসমূহকে বলা হয়েছে মাতৃকা। মাতৃকা বলতে শিবেরই শক্তি বোঝায়। মন্ত্রও শক্তিরূপ। মন্ত্রের দেহ হচ্ছে বর্ণমালা আর এই বর্ণমালাকেও শিবেরই শক্তি বা মাতৃকা বলে জানতে হবে।

ঈশ্বর অশরীরী হ'লেও সাধকের হিতের জন্যে শরীর গ্রহণ করেন। তিনি নিরাকারও বটেন, আবার সাকারও বটেন। তিনি যদি সাকার না হন, তা হ'লে ভক্তের পক্ষে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁর উপাসনা করা সম্ভবপর হয় না।

শৈব দর্শনে 'শিবত্বযোগী' নামে একটি কথা ব্যবহৃত হয়েছে। শিবত্বের সঙ্গে যা' কিছুর যোগ রয়েছে, তাকেই বলা হয়েছে শিবত্বযোগী। মন্ত্র ও দীক্ষা মানুষের জীবত্ব ঘুচিয়ে শিবত্ব দান করে, এজন্যে এরাও শিবত্বযোগী। আবার মুক্তাত্মা পুরুষগণকেও শিবত্বযোগী বলা হয়। যাঁরা শিবকল্প পুরুষ বা বিদ্যেশ্বর, তাঁরাও শিবত্বযোগী। কেননা, এঁরা কঠোর তপস্যার বলে শিবের সাদৃশ্য বা তুল্যতা লাভ করেছেন।

শৈব দর্শনের মতে জীবাত্মা কখনও দেশ বা কালের দ্বারা সীমিত বা পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। এই আত্মা হচ্ছেন সর্বব্যাপী ও নিত্য। বৈদান্তিকদের মতে আত্মা এক কিন্তু সাংখ্য যেমন পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেছেন, শৈব দর্শনও তেমনই জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাংখ্যের মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয় আর শৈব দর্শনের মতে জীবাত্মা ক্রিয়াশীল।

জীবাত্মায় যেমন চৈতন্য রয়েছে, তেমনই কর্তৃত্বও রয়েছে। জীবাত্মায় যদি কর্তৃত্ব না থাকতো, তা হ'লে কেমন করে' সে তপস্যার দ্বারা পাশ ছিন্ন করতো? মুক্ত আত্মা শিবত্ব লাভ করেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁর কর্তৃত্বের অভাব ঘটে না।

শৈব দর্শনে 'পশু'কে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যে মালিন্য আত্মাকে আশ্রয় করে' থাকে, সেই মালিন্য বা দুষ্ট ভাবই হচ্ছে পশুত্বের মূল। এই দুষ্ট ভাব বা কলুষই আমাদের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যখন এই কলুষ দূর হয়, তখনই হয় আমাদের 'স্বরূপে অবস্থিতি'। কাজেই শিবত্ব লাভ করতে হ'লে আমাদের গোড়াতেই চিত্তশুদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। পাশুপত দর্শনে বলা হয়েছে, আমাদের মনের কলুষ বা মলিনতা হচ্ছে পাঁচ রকমের। মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, বিষয়ে আসক্তির জন্যে তার সঙ্গে সংস্পর্শ, সদাচার থেকে ভ্রষ্ট হওয়া (চ্যুতি) ও সংস্কার। (এই সংস্কারই হচ্ছে জীবত্বের মূল।) আর এই পাঁচ রকমের মলিনতা থেকে মুক্তির নামই হচ্ছে বিশুদ্ধি। যাকে বিশুদ্ধি বলা হয়েছে, আমরা তাকেই বলতে পারি দেহ ও মনের রূপান্তর বা metamorphosis। বাস্তবিক, বিশুদ্ধি লাভ করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে নবজন্ম লাভ করা, ভগবান ঈশার ভাষায় being born again.

শৈব দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। এই সৃষ্টিতত্ত্ব মূলত সাংখ্য দর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয়। শৈব দর্শনের মতে মায়াই হচ্ছে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, প্রলয়কালেও এর নাশ নেই। পরমেশ্বর ও মায়া উভয়েই নিত্য ও অবিনাশী। এদের সংযোগে প্রথম উৎপন্ন হয় কলা। (এই কলাকে মায়ার পরিণাম ও ত্রিগুণের অতীত বলা হয়েছে।) কলা থেকে কাল, কাল থেকে নিয়তি, নিয়তি থেকে বিদ্যা বা চিত্ত, বিদ্যা থেকে রাগ বা বিষয়াসক্তি এবং রাগ থেকে প্রকৃতি বা ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই প্রকৃতি থেকে জন্মে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক ও দশটি ইন্দ্রিয়। তারপর স্থূল দেহের উৎপত্তি হয়। সাংখ্য দর্শনের মতো শৈব দর্শনও পরিণামবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন।

শৈব দর্শনে 'পাশ' বলতে কী বোঝায়? পাশ হচ্ছে চার রকমের, (১) মল অর্থাৎ যে মালিন্য আত্মাকে আশ্রয় করে, (২) কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম, (৩) মায়া বা অবিদ্যা, ও (৪) রোধশক্তি, যা মানুষের জ্ঞানকে ঢেকে রাখে। পাশবদ্ধ জীব ফলের কামনায় কর্ম করে। আর মানুষের কর্ম বিচিত্র বলেই জগতে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। সৃষ্টি হচ্ছে অনাদি, তবে মহাপ্রলয়ের কালে সমস্ত পদার্থই মায়াতে লীন হয়ে যায়।

পাশুপত দর্শন বলেন, ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত যা' কিছু বিদ্যমান, সবই দেবদেব মহাদেবের পশু অর্থাৎ তাঁর অধীন। তবে পশু যখন মুক্ত হয়, তখন সে মহেশ্বরের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হয়। এই দর্শনের মতে মুক্তিলাভের জন্যে জ্ঞান ও ভক্তি দু'য়েরই প্রয়োজন রয়েছে। মহেশ্বরে যাঁর 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' আছে. তিনিই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া কখনো মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে পঞ্চপদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান। কারণ বল্‌তে বোঝা যায়, পতি বা মহেশ্বর, তিনিই জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম অনুসারে ফল দান করেন, কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান ব'লে কর্মের অপেক্ষা না করেও জীবগণকে ফল দান করতে পারেন। 'কার্য' বলতে বোঝায় চেতন ও অচেতন পদার্থ, যাদের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। 'যোগ' বলতে বোঝায় জপ, ধ্যান প্রভৃতি। 'বিধি' বলতে বোঝায় নিয়ম, যেমন ভস্মস্নান ইত্যাদি; আর দুঃখান্ত বলতে বোঝায় ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। এই তত্ত্বজ্ঞানই হচ্ছে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমরা সংক্ষেপে শৈব দর্শনের আলোচনা করলাম। সংস্কৃত ভাষায় শিবের সম্পর্কে যে সমস্ত স্তোত্র রচিত হয়েছে, তার ভিতর শঙ্করাচার্য-বিরচিত 'শিব-পঞ্চাক্ষর স্তোত্র', রাবণ কৃত 'শিবতাণ্ডব স্তোত্র' ও পুষ্পদন্ত বিরচিত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবমহিম্ন স্তোত্রে ধর্মসমন্বয়ের উদার আদর্শ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। ভক্ত ও সাধকের দৃষ্টিতে শিবের যে অলৌকিক মহিমা দীপ্যমান হয়ে উঠেছে, এইসব স্তোত্রগুলোর ভিতর তার পরিচয় পাওয়া

যায়। পশুপতির সেই মহিমার ধ্যান করতে পারলে আমরাও সকল পাশ থেকে মুক্ত হ'তে পারি। ভক্তগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও যেন বলতে পারি—

'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

দৈহিক অমরতা

উনিশ শতকের একজন মনস্বী বাঙালী লেখক "ঐহিক অমরতা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন এককালে প্রত্যক্ষবাদী ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোম্‌টের (August Comte) ভাব-শিষ্য। তাঁরই ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালী লেখক লিখেছিলেন—ইতিহাস যাঁকে ভোলে না, মানুষের স্মৃতিতে যিনি বেঁচে থাকেন, তিনিই যথার্থ অমর। অর্থাৎ কিনা, কীর্তির্যস্য স জীবতি, যিনি কীর্তিমান, তিনিই সংসারে জীবিত, এরই নাম ঐহিক অমরতা। এ ছাড়া পরলোকের অস্তিত্বেরই যখন কোন প্রমাণ নেই, তখন পারলৌকিক অমরতার কথা কল্পনামাত্র। কিন্তু আমরা আজ ঐহিক অমরতার কথা বলছিনে, আমরা বলছি দৈহিক অমরতার কথা। দৈহিক অমরতার কথা বললে একালের লোকে হয়তো বাতুল বলে উপহাস করবে, কিন্তু একদিন সত্যিই চিরঞ্জীব হবার কল্পনা মানুষকে পেয়ে বসেছিল। বৈদিক ঋষি যে প্রার্থনা করেছিলেন—'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়,' আমায় মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও, এ সে অমরতা নয়, অথবা মৈত্রেয়ী যে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ?'—আমি যার দ্বারা অমরতা লাভ করতে না পারব, তার দ্বারা আমি কী করব—এ সে অমরতাও নয়। মানুষ সত্যিই একদিন দৈহিক অমরতা লাভের কল্পনা করেছিল। শুধু কল্পনা নয়, সে একদিন সত্যি চেষ্টা করেছিল, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে, জরাকে অতিক্রম করে চিরকাল পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে। জীববিজ্ঞানীরাও এক রকম অমরতার কথা বলেন, আর সে অমরতা তাদের দৈহিক অমরতাই বটে। তারা বলেন, সন্তানসন্ততির ভেতর দিয়ে পুরুষানুক্রমে জীবের দেহ বেঁচে থাকে। আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—সর্বনাশ উপস্থিত হ'লে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেক ত্যাগ করেন, এই কথার সূত্র ধরে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "মানুষ মৃত্যু-রূপ সর্বনাশ উপস্থিত দেখে আপনার অর্ধেককে অপত্যরূপে রেখে যান।"

অপত্য যে আমাদেরই অর্ধেক, তাতে সন্দেহ নেই ; কারণ অপত্যের ভেতর দিয়ে আমরা নিজেরই প্রতিরূপ দেখতে পাই। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' অপত্যের ভেতর দিয়েও মানুষ বেঁচে থাকবার কামনাকে আংশিকভাবে সার্থক করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু কীর্তির ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকব বা অপত্যের ভেতর দিয়ে অমরতা লাভ করব—এ চিন্তা মানুষকে পরিপূর্ণ ভাবে আশ্বস্ত করে নি। সে চেয়েছে দেহটাকে অমর করে রাখতে। চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্যে সে কত মন্ত্র, কত ওষধি, কত মণিরত্নের আশ্রয় নিয়েছে। অবশেষে, মৃত্যু যখন সত্যি তাঁর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে হয়তো মধুসূদনেরই মত বিলাপ করে বলেছে--"চিরস্থির, কবে নীর হায় রে জীবন-নদে !"

মৃত্যু যে ধ্রুব, বৈদিক ঋষিরা সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। তাই তাঁরা দীর্ঘ জীবন চেয়েছেন, দৈহিক অমরতার প্রার্থনা করেন নাই। 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ,' তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছেন—'পশ্যেম শরদাং শতং, জীবেম শরদাং শতং,' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমরা যেন শত শরৎ (শত বৎসর) দর্শন করতে পারি, শত শরৎ বেঁচে থাকতে পারি। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম সকল করে শত বৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করবে।

'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ'।

কেমন করে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে মহামতি চরক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। চরক-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখতে পাই, উগ্রতপা ভরদ্বাজ মুনি দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় জানবার জন্যে শরণ্য অমরেশ্বর অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। পবনবিজয় স্বরোদয়ে দেখা যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাণের ওপর প্রাণিগণের আয়ুর হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা নির্ভর করে। যে প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া যত বেশী, তার আয়ু তত কম। যোগীরা জানেন, প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে (পূরক, রেচক,-কুম্ভকের দ্বারা) মানুষ অপরিমিত আয়ু লাভ করতে পারে। যোগীরা এমন অবস্থায়ও বেঁচে থাকতে পারেন, যে

অবস্থাটাকে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থা বলা যায়। যোগশাস্ত্রে মানুষের অনেক বিভূতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মানুষ এই পাঞ্চভৌতিক দেহটাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, এমন কথা বলা হয় নি।

খনার বচনে বলা হয়েছে, মানুষের ঊর্ধ্বতম জীবিতকাল একশো বিশ বছর, ঘোড়ার ষাট বছর, বলদের বাইশ বছর, ছাগলের তের বছর ও শূকরের সাড়ে ছয় বছর।

'নরা গজা বিশে সয় তার অর্ধেক হয় হয়।

বাইশ বলদা তের ছাগলা আর অর্ধেক বরা পাগলা॥'

বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুভীতি প্রাণিমাত্রেরই সহজাত, কিন্তু একমাত্র মানুষই দীর্ঘ জীবন লাভের জন্যে সচেতন প্রয়াস করেছে, জরা ও ব্যাধিকে জয় করবার জন্যে রসায়নের আবিষ্কার করেছে ('যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্'), এমন কি, এই ভোগায়তন দেহটাকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের মানুষও একদিন দৈহিক অমরতা লাভের স্বপ্ন দেখেছিল। শুধু স্বপ্ন দেখে নি, এ বিষয়ে সে যথেষ্ট পরীক্ষাকার্যও চালিয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষ একদিন রস বা পারদের অদ্ভুত শক্তি দেখে এ কথা বিশ্বাস করেছিল যে, পারদের যথাবিধি সেবনের দ্বারা মানুষ দৈহিক অমরতা ও মুক্তি উভয়ই লাভ করতে পারে। রসেশ্বর দর্শনে বলা হয়েছে—

'সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃ স্মৃতঃ।'

পারদ নামের অর্থ হচ্ছে, যা পারকে দান করে। কিসের পার? সংসার-সমুদ্রের পার। অর্থাৎ কিনা, মানুষকে সংসার-সমুদ্রের পারে নিয়ে যায় বলেই এর নাম পার-দ।

রসেশ্বর দর্শন বলেন, এই পারদ সেবনের দ্বারাই দেহের স্থৈর্য, দিব্যত্ব ও দৃঢ়তা প্রাপ্তি হয়। আমাদের দেহে ছয়টি কোষ আছে, যথা—ত্বক, রক্ত ও মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা। এই দেহ যে অনিত্য, তা তো নিত্যই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু রস ও অভ্রক সেবনের ফলে আমরা এই দেহ ত্যাগ না

করেই হরগৌরীর স্পষ্ট দিব্যদেহ লাভ করতে পারি, জীবন্মুক্ত ও রসসিদ্ধ হতে পারি। এই দিব্য দেহ লাভ করলে মন্ত্রসকল কিঙ্কর অর্থাৎ দাসের মত আমাদের আদেশের অনুসরণ করে।

'অভ্রকস্তব বীজং তু মম বীজং তু পারদঃ!
অনয়োর্মেলনং দেবি মৃত্যুদারিদ্র্যনাশনম্॥'

মহাদেব বলছেন, হে দেবি, তোমার বীজ হচ্ছে অভ্রক, আর আমার বীজ হচ্ছে পারদ। এদের সংযোগ ঘটলে দারিদ্র্য ও মরণ দূর হয়ে যায়।

রসেশ্বর দর্শনে তাই বলা হয়েছে, প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের স্থৈর্য লাভ করা যায়, আবার পারদ সেবনের দ্বারাও একই ফল লাভ হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতের রাসায়নিকেরা পারদের প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হয়েছিলেন কেন? তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, রস বা পারদের দ্বারা লৌহবেধ করলে তা স্বর্ণে পরিণত হয়, (কৌতূহলী পাঠক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ইংরেজী গ্রন্থে স্বুবর্ণতন্ত্রের অনেক উদ্ধৃতি দেখতে পাবেন), তাই তাঁরা উপমা বা analogyর সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পারদ সেবন করলে দেহেও রূপান্তর ঘটে। তা ছাড়া, রস বা পারদ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, পারদের বিশেষ প্রয়োগের দ্বারা জীব খেচরী গতি লাভ করে, অর্থাৎ কিনা তারা পাখির মত আকাশে উড়ে যেতে পারে। রসেশ্বর দর্শন বলেন, মুক্তি লাভ করতে হলে পারদের দ্বারা দেহের সংস্কার করা দরকার। রসেশ্বর দর্শনে মাধবাচার্য বলেছেন, ঈশ্বর যে সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ তা যোগীরা সমাধির অবস্থায় উপলব্ধি করে থাকেন। কিন্তু মানুষের দেহ শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগের অধীন,...ষোল বৎসর পর্যন্ত মানুষের ভেতর দেখা যায় বাল-চাপল্য; তারপর সে যৌবন প্রাপ্ত হয়ে বিষয়সুখে মত্ত হয়, তার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। যখন তার চৈতন্য হয়, তখন দেখতে পায় তার দেহ জরাজীর্ণ, তার কর্মশক্তি ক্ষীণ; সুতরাং মানুষ কেমন করে মুক্তিলাভ করবে? সুতরাং যাঁরা মুক্তিকামী, তাঁরা পারদ সেবনের দ্বারা দিব্য-শরীর লাভ করবেন।

দর্শনশাস্ত্রে জীবন্মুক্তির কথা আছে, আবার বিদেহমুক্তির কথাও আছে।

কিন্তু রসেশ্বর দর্শন বলেন, জীবন্মুক্তি লাভ করতে হলে রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়। আমরা জীবন্মুক্ত বলি কাকে? যিনি এই দেহে বর্তমান থেকেই মুক্তি লাভ করেন। আর বিদেহমুক্ত বলি কাকে? যিনি মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করেন। রসেশ্বর দর্শনের সিদ্ধান্ত এই—রসের সেবনের দ্বারা দেহের স্থৈর্য সম্পন্ন হলেই জীবন্মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তা ছাড়া দেহই হচ্ছে চতুর্বর্গের মূল। চতুর্বর্গ কি? না—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য হচ্ছে এমন দেহ, যা জরা ও মরণের অধীন নয়। একমাত্র রসরাজ অর্থাৎ পারদের সাহায্যেই আমরা জরা ও মরণকে অতিক্রম করতে পারি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মের সম্পর্কে বলেছেন 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। রসেশ্বর দর্শন বলেন, এ রস হচ্ছে পারদ। কেন না, পারদ সেবন করেই মানুষ পরম আনন্দ লাভ করে।

রসেশ্বর দর্শনে পারদ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ পড়ে দেখতে পারেন। এই দর্শনে পারদ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এতে পারদের স্মরণ ও পূজায় যে ফলশ্রুতি হয়, তাও বলা হয়েছে।

আরব দেশের রাসায়নিকগণও (Alchemist) অন্যান্য ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে জানতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানব-দেহেরও রূপান্তর সাধন করা যায়। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি জীবনরসায়ন (elixir of life) আবিষ্কার করতে যা সেবন করলে দেহ স্থির ও দৃঢ় হয় এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়।

রসায়ন সেবনের দ্বারা মানুষ যে অনেক ক্ষেত্রে জরা ও ব্যাধিকে অনেকটা প্রতিহত করতে পারে, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। ঔষধবিশেষের দ্বারা দেহেরও কিছুটা রূপান্তর ঘটে তাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিনা ভেষজেও শুধু চিন্তার দ্বারা বা সাধনার দ্বারা মানুষ দেহ ও মনের রূপান্তর সাধন করতে পারে। বৈষ্ণব সাধক বলেন, যথার্থ বৈষ্ণব অপ্রাকৃত দেহ বা ভাগবতী তনু

লাভ করেন। যীশু একে বলেছেন, নবজন্ম-লাভ being born again. তাঁর উক্তি হচ্ছে, 'যে পর্যন্ত তোমরা নবজন্ম লাভ না কর, সে পর্যন্ত তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পার না।' যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হয়েছে, শিখিধ্বজ-পত্নী চূড়ালা অভ্যাস-যোগের দ্বারা বৃদ্ধবয়সে নবোদ্‌গতা লতার মতো শোভা পেয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। আমরা জানি, কোন ভেষজ যতই কেন শক্তিশালী হোক না, তার দ্বারা মৃত্যুকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। হয়তো তাতে জরা ও ব্যাধিকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। হয়তো তার দ্বারা দেহের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি লাভ করা যায়—বল, বীর্য, ওজঃ, উৎসাহ, লাবণ্য, সৌকুমার্য এ সকল কাম্য বস্তুও ভেষজের গুণে মানুষ লাভ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির যেটা অলঙ্ঘনীয় বিধান তাকে অতিক্রম করার শক্তি মানুষের নেই, এ রকমের প্রয়াসও মানুষের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তবে যিনি সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ, তিনি হয়তো মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে পারেন, মৃত্যুকে সম্বোধন ক'রে তিনি অবিচল কণ্ঠে বলতে পারেন—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়,
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনো-মধুকরে,···
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি সাধকগণ জগজ্জননীর চরণে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুভয়কে জয় করেছিলেন। গোবিন্দ চৌধুরী গেয়েছেন—

"আমি চল্লেম রে ভাই সেই আনন্দ-কাননে,
সংসারেরি লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে।"

রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক ও ব্রাউনিং দার্শনিক-কবির দৃষ্টিতে মৃত্যুর মঙ্গলময়

-রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তবু এঁদের কথা আমাদের কতটা আশ্বস্ত করেছে বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লয় মোরে টানি।"

কিন্তু মাতা যখন সন্তানকে স্তন থেকে স্তনান্তরে নিয়ে যান, তখন শিশু যে মুহূর্তের জন্যে ভয়ে কম্পিত হয়, তার উপায় কি? আমরাও যে শিশুর মতই ভয়ে কাতর, আমরা যা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, অন্তরে তা উপলব্ধি করতে পারি নে।

অথচ দেখতে পাই, অনেক নাস্তিক ব্যক্তিও মৃত্যুকে সহজে বরণ করে নিয়েছেন, যেমন দার্শনিক ডেভিড হিউম। আবার ধার্মিক বলে খ্যাত অনেক ব্যক্তিও মৃত্যুচিন্তায় ভীত কম্পিত হয়ে পড়েছেন।

তবে একটা কথা, সকল প্রাণীর ভেতরেই বাঁচবার ইচ্ছা রয়েছে, আর মানুষের মনে পাশাপাশি দুটো ইচ্ছা রয়েছে—বাঁচার প্রবৃত্তি ও মরে যাওয়ার ইচ্ছা। এটা অবশ্য মনঃসমীক্ষকদের সিদ্ধান্ত, কিন্তু সংসারে এমন মানুষ বিরল যার মনে কোন কালে বা কোন অবস্থায় মৃত্যুকামনা জাগে নি। তবু যা অজ্ঞাত, যা সীমাহীন রহস্যে আবৃত, তা মানুষের মনে চিরদিনই একটা আশঙ্কার সৃষ্টি করে। তাই হ্যামলেটের সেই আত্মগত চিন্তার ভেতর ('To be or not to be, that is the question) আমরা যেন আমাদিগকেই আবিষ্কার করি।

এ যুগের একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন, দৈবী ইচ্ছার প্রভাবে মানুষ অমর ও অজর হতে পারে, এবং নিখিল বিশ্বের রূপান্তর সাধন করতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, মানুষী ইচ্ছার দ্বারা দৈবী ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে মানুষের ইচ্ছারই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু মানুষের স্থূল দেহটা মৃত্যুর অধীন বলেই সংসারে উন্নতির স্রোত আজও অব্যাহত আছে. মানুষ সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছে, ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কুচিত করেছে, ঔদ্ধত্য অহমিকাকে খর্ব করেছে, তার অন্তরে

বৈরাগ্যের সুর বেজে উঠেছে। বিধাতা পরম রসিক, তাই মানুষকে অনেক কিছু জানবার অধিকার দিলেও আয়ুষ্কাল জানবার অধিকার দেন নি। মানুষ অনাগতকে জানবার জন্যে ফলিত জ্যোতিষের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্র হয়তো ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনীদের মতই কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা ও কিছু দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।

প্রাচীন গ্রীকেরাও দৈহিক অমরতার কথা কল্পনা করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কাহিনীতে আছে, টিথনাস (Tithonus) নামে এক ব্যক্তি উষাদেবী বা অরোরার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি দেবতাদের কাছে অমরতার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং দেবতারাও তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি অমর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ অজর হতে চান নি। টেনিসন লিখেছেন, টিথনাস অমর হয়েছিলেন কিন্তু যথাকালে তাঁর দেহ জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মৃত্যু অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। কিন্তু যদি সত্যিই তিনি জরাকে অতিক্রম করতে পারতেন? যদি তিনি স্থিরযৌবন প্রাপ্ত হয়ে চিরদিন স্থিরযৌবনা অরোরার সাহচর্যলাভ করতেন, তা হলেও কি একদিন পৃথিবী তাঁর চোখে জীর্ণ, পুরাতন, নিতান্ত অর্থহীন বলে মনে হত না? স্থিরযৌবনা অরোরার গণ্ড দুটি কি এক দিন তাঁর কাছে রক্তবিহীন, পাণ্ডুর বলে বোধ হত না? সেদিন যদি মরণ এসে তাঁর সামনে দাঁড়াত, তা হলে তার মুখে তিনি হয়তো অনির্বচনীয় মাধুরী আবিষ্কার করতেন।

মানুষ যদি সত্যি দৈহিক মৃত্যুকে জয় করতে পারত, তা হ'লে সংসারে কলির অধিকার পূর্ণ হত। তাই প্রকৃতি আমাদের দেহের প্রতি নির্মম। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণ করে মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলি, প্রকৃতি আমাদের যশঃ-শরীরে দয়ালু। আমরা দৈহিক অমরতা লাভ করতে না পারলেও কঠোর সাধনার দ্বারা ঐহিক অমরতা লাভ করতে পারি। মানুষ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, তাই যারা বুদ্ধিমান, তারা দৃঢ়মুষ্টিতে সময়ের অগ্রকেশ ধরেন, যাকে ইংরেজীতে বলে Taking time by the

fore-lock. তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন, প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর কর্মে বা চিন্তায় বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিয়োজিত করেন। দৈহিক অমরতা যদি মানুষের করায়ত্ত হত, তা হলে এমনটি সম্ভব হত না, মানুষের জীবন যদি অপরিমিত দীর্ঘ হত, তা হলেও হয়তো সম্ভব হত না। এইখানেই মৃত্যুর একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সকল দেশেই এমন অনেক দীর্ঘজীবী মানুষ বর্তমান ছিলেন, ইতিহাস যাঁদের কোন সন্ধান রাখে না। আবার অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ সংসারে জন্মেছিলেন যাঁরা অল্পকাল বেঁচে থেকেও ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। যাঁরা শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকেন, তাঁরা দৈহিক অমরতাকে স্পৃহণীয় বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা সংসারে কল্যাণকৃৎ, তাঁদের জীবন স্বল্প-পরিসর হলেও তাঁরা সত্যই মৃত্যুরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁরা রসস্রষ্টা কবি, অতন্দ্রিত জ্ঞান-তাপস, অনলস কর্মযোগী, অমরতা তাঁদেরই করতলগত। মনস্বিনী বিদুলা পুত্র সঞ্জয়কে বলেছিলেন, দীর্ঘকাল ধূমায়িত হয়ে থাকার চাইতে মুহূর্ত কাল জ্বলে ওঠা ভাল।

'মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ ন তু ধূমায়িতং চিরম্।'

দৃষ্টি

আফিংখোর কমলাকান্ত অহিফেনের প্রসাদে দেখেছিলেন, এ সংসার একটি বৃহৎ বাজার, এখানে অনবরত কেনা-বেচা চল্‌ছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য-জীবন বলে'। যে কমলাকান্ত ছিলেন অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী, 'কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী' এবং অহিফেন ভিন্ন অন্য দ্রব্যে আসক্তিশূন্য, তিনি কেমন করে এই 'বৈশ্য-দৃষ্টি' লাভ করলেন, বল্‌তে পারিনে; কিন্তু কমলাকান্তের দৃষ্টিই যে একমাত্র সত্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টি, একথা আমরা স্বীকার করিনে। যাঁরা বলেছেন, সংসারটা হচ্ছে স্বপ্ন বা মায়া বা ভগবানের লীলা-বিলাস, তাঁদের দৃষ্টি হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য-দৃষ্টি, যাঁরা সংসারকে একটা বিশাল সংগ্রাম-ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি ক্ষাত্র-দৃষ্টি, আর যাঁরা মনে করেন, সংসারটা হচ্ছে এমন একটা স্থান, যেখানে আমরা জন্মেছি পরস্পরের সেবা কর্‌তে, অপরের কাছে কোনো প্রতিদান চাইবার অধিকার আমাদের নেই, তাঁদের দৃষ্টিকে বলতে পারি শূদ্র-দৃষ্টি। এ ছাড়া সংসারকে কেউ দেখেছেন রঙ্গমঞ্চরূপে, কেউ দেখেছেন পান্থশালারূপে, কেউ দেখেছেন পাঠশালা অর্থাৎ শিক্ষাশালারূপে, কেউ দেখেছেন একটা দুঃস্বপ্নরূপে, আবার কেউ দেখেছেন কারাগৃহরূপে। এঁদের দৃষ্টিকে কোন্ আখ্যায় অভিহিত করা উচিত, পাঠকগণ তার বিচার করবেন।

এ ছাড়া আর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যাকে বলা চলে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা যায়, সংসার একটি সেবাশ্রমও বটে, বৃহৎ পণ্য-বীথিকাও বটে, সংগ্রাম-ক্ষেত্রও বটে, আবার খেলাঘরও বটে। এখানে আমরা হবো মানুষের সেবক, আবার এখানেই আমরা অপরকে তাদের 'পাওনা' চুকিয়ে দিয়ে নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করে নেবো কড়ায়-গণ্ডায়;—আমরা হবো নিপুণ সৈনিক, সংগ্রামের ভিতর দিয়েই আমরা করবো সত্যের প্রতিষ্ঠা, আবার সকল কামনা-বাসনা-আসক্তি ত্যাগ

ব'রে' আমরাই করবো সংসারের রস বা আনন্দটুকুর আস্বাদন। অনুতপ্তা পিঙ্গলা যখন বলেন :

'আশা বৈ পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং'—

'সংসারে আশাই হচ্ছে পরম দুঃখ, আর নৈরাশ্য অর্থাৎ বাসনাত্যাগই পরম সুখ'—

তখন আমরা দেখি, তিনি ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি লাভ করেছেন। আবার বিদুলা যখন পুত্রকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্যে বলেন :

"মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ নতু ধূমায়িতংচিরম্"—

চিরকাল ধূমায়িত হয়ে থাকার চেয়ে মুহূর্তকাল জ্বলে ওঠা ভালো—

তখন আমরা তাঁর ক্ষাত্র দৃষ্টির পরিচয় পাই। আবার গীতায় ভগবান যখন বলেন :

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ—

'পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করেই তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করো'—

তখন আমরা বুঝতে পারি, যথার্থ বৈশ্যদৃষ্টি কাকে বলে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে যখন পড়ি :

'যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং
তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্'—

'যতটুকু দ্রব্যে উদর পূর্ণ হয়, ততটুকুতেই দেহিগণের অধিকার রয়েছে'—(এর পরেই বলা হয়েছে—যে, এর চেয়ে বেশী কিছু ভোগ বা অধিকার করে, সে হচ্ছে চোর, অতএব দণ্ডার্হ)—

তখন বুঝতে পারি, সত্যিকার শূদ্রদৃষ্টি কাকে বলে। আমার যা ন্যূনতম প্রয়োজন, তাই আমি গ্রহণ করতে পারি, তার বেশী যা কিছু তা' ব্যয় করতে হবে পরের কল্যাণে, নিয়োজিত করতে হবে পরের সেবায়,—এই তো যথার্থ সেবক বা শূদ্রের আদর্শ।

এই যে চার রকমের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম, এর সবগুলোরই আসল কথা হচ্ছে, জীবনটাকে যজ্ঞরূপে দেখা। জীবনটাকে যিনি যজ্ঞরূপে দেখেন, তিনিই

হচ্ছেন সম্যগ্‌দর্শী বা যথার্থ দ্রষ্টা। দেবতা বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় তারই নাম হচ্ছে যজ্ঞ। সুতরাং যজ্ঞ আর দেব-পূজন হচ্ছে একই জিনিস। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে :

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'॥

গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী হবেন। তাঁরা যা' কিছু করবেন, সকলি পরব্রহ্মে অর্পণ করবেন।

বাংলার শক্তি-সাধক এই যাজ্ঞিক দৃষ্টি লাভ করে গেয়েছেন :

'আহার কর, মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে;
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

সাধকের দৃষ্টিতে সংসার হচ্ছে একটি বৃহৎ যজ্ঞশালা, আর আমরা হচ্ছি যাজ্ঞিক ;—এই জন্যে ইন্দ্রিয়সুখ বা ব্যক্তিগত সুখ কখনো আমাদের কাম্য হতে পারে না। আমাদের সকল করণীয় কর্মের মূলে রয়েছে বিধাতার নির্দেশ, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—সমাজের কল্যাণ-সাধন। এই জন্যে গীতায় বলা হয়েছে, কর্ম-সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থ হোন, সন্ন্যাসী হোন, সবাইকে কর্ম করতে হবে এবং সেই কর্মফল ভগবানে অর্পণ করতে হবে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, সন্ন্যাসীকেও যজ্ঞহীন হলে চলবে না। মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যও সর্বজনের হিতের আদর্শ প্রচার করেছেন। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী তাঁর 'দাশ-বোধে' সন্ন্যাসীদিগকে লোক-হিত সাধন করতে, ধর্মের গ্লানি দূর করতে উপদেশ দিয়েছেন। এ রকমের কর্ম যেখানে আসক্তিশূন্য, সেখানে এই কর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপাসনা। সাধক বলেছেন—হে জগন্মাতঃ, আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ও পুনরায় সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা' কিছু করি, সকলই হচ্ছে তোমার উপাসনা :

'প্রাতরুত্থায় সায়ং বা সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্‌'॥

২

অনেকে মনে করেন, লোক-সেবার আদর্শ ভারতবর্ষে ছিল না। এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত, তা' প্রমাণ করবার জন্যে মহাভারতের একটি শ্লোকই যথেষ্ট :

'দেয়মার্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্॥

বনপর্ব, ২।৫৪

রোগীকে করিবে দান আদরে শয়ন।
বসাবে আসনে তারে শ্রান্ত যেই জন॥
পানীয় আনিয়া দিবে তৃষ্ণাতুর জনে।
ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবে যতনে'॥

(মহিমচন্দ্র সেনের অনুবাদ)

তবে, এ কথাও সত্য যে আমাদের লোকসেবা ও পাশ্চাত্ত্যের ফিল্যানথ্রপির আদর্শের ভিতর একটি মর্মগত পার্থক্য আছে। 'ফিল্যানফ্রপির' আদর্শে অভিমানের খানিকটা পরিতৃপ্তি আছে, 'পরের উপকার করছি'—এই বোধ আছে ; কিন্তু আমাদের দেশে লোক-সেবা হচ্ছে একটা যজ্ঞ, যাতে কল্যাণ হচ্ছে শুধু সেবকের আর দুঃখ-মোচন হচ্ছে অপরের। তাই আমাদের আদর্শ হচ্ছে আসক্তিশূন্য হয়ে লোক-সেবা করা। অভিমান আমাদের বিসর্জন দিতে হবে, কেননা, অভিমান হচ্ছে রজোগুণ ; কিন্তু দয়াবৃত্তিকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন নেই ; কেননা, দয়া হচ্ছে সত্বগুণ, উহা একদিন আমাদিগকে লক্ষ্যে পৌছে দেবেই। দয়া আর মায়া এক জিনিস নয় ; এরা দুটি বোন হলেও দুই সতীনের মতো ; সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

পাশ্চাত্ত্যের 'ফিল্যানথ্রপি' হচ্ছে পুণ্যকর্ম কিন্তু আমাদের লোক-সেবা পুণ্য-কর্ম নয় (?), কেননা পুণ্য কর্ম আমাদের আদর্শ নয় ;—আমাদের আদর্শ হচ্ছে পাপ-পুণ্যের পারে যাওয়া, transvaluation of all values, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্যই গুরুতর।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কিন্তু পাপ-পুণ্যের পারে যেতে পারেন নি। তাঁর মনে

একটা প্রবল অভিমান ছিল যে, তিনি সত্যবাদী। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশও তিনি অকুণ্ঠভাবে পালন করতে পারেন নি। অশ্বত্থামা হত—এ কথাটা দ্রোণাচার্য্যের কাছে নিবেদন করতে তাঁর সত্যবাদিতার অভিমানে আঘাত লেগেছিল। তাঁকে কিন্তু নরক দর্শন করতে হয়েছিল মিথ্যা বলার অপরাধে নয়, পুণ্যের অহঙ্কারের জন্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—পাপ ও পুণ্য দুটোই বন্ধন; একটা হচ্ছে লোহার শিকল আর একটা সোনার শিকল। পাখীকে লোহার শিকলই পরাও, আর সোনার শিকলই পরাও, দুটোই তার পক্ষে প্রায়-সমান।

ভারতীয় সাধনার মর্ম-মূলে প্রবেশ না করলে অবশ্য এ সব কথা খুব অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু অদ্ভুত হলেই তা মিথ্যা হয় না।

প্রকৃতির রাজ্যেও অনেক অদ্ভুত বস্তু আমরা দর্শন করি যন্ত্রের সাহায্যে, যা চর্ম-চক্ষে দেখা যায় না, ধরা পড়ে না। আবার মানুষের যখন তৃতীয় নেত্র খুলে যায়, তখন বিশ্বের অনেক রহস্যই তার কাছে প্রকাশ পায়। তাই আমাদের দেশের ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে মন্ত্রসকল দর্শন করেছেন; অবশ্য প্রতীচ্য দেশের কেনো কোনো মনীষীও যে সত্যকে দর্শন করেন নি বা অন্ততঃ দূর থেকেও সত্যের আভাস পান নি, তা নয়। কিন্তু সে সব দেশের লোকেরা এঁদের অলোক-পন্থী বা 'মিস্টিক' বলে কোণঠাসা করে রেখেছেন, কেউ কেউ বা সাহস করে এঁদের বলেছেন, দ্রষ্টা বা seer। আমাদের দৃষ্টি আবিল বলেই আমরা সত্যকে দেখতে পাই নে, কিন্তু প্রজ্ঞা-চক্ষু যাঁদের উন্মীলিত হয়েছে; তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, তাই তাঁরা আমাদের বরেণ্য। অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমরা, আর একমাত্র তাঁরাই জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা আমাদের চক্ষুরুন্মীলন করে দিতে পারেন।

(৩)

আমরা সত্যি অন্ধ, কেননা, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই। চণ্ডীতে বলা হয়েছে, সংসারে কোনো প্রাণী দিবান্ধ অর্থাৎ দিনে দেখতে পায় না, কোনো প্রাণী রাত্র্যন্ধ অর্থাৎ রাত্রে দেখে না, আবার কোনো প্রাণী দিনে ও রাত্রে তুল্যদৃষ্টি

অর্থাৎ সমানভাবেই দেখতে পায়। মানুষ তো এক হিসাবে দিবা ও রাত্রিতে তুল্যদৃষ্টি ; অবশ্য এ সংসারে রাতকানার সংখ্যাও একেবারে কম নয় ; আবার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সংসারে দিনকানাও নাকি আছে। (মাধবনিদান দ্রষ্টব্য কিন্তু আমরা চক্ষুষ্মান মানুষের সম্পর্কেও স্নেহান্ধ, মোহান্ধ, কামান্ধ, ভ্রমান্ধ ইত্যাদি কথাগুলো ব্যবহার করে থাকি)। যদিও হেমচন্দ্র 'বিধাতা-নির্মিত চারু মানব-নয়নকে' পরশমণি বলেছেন, তথাপি খাঁটি পরশমণি কিন্তু বাইরে নয়, অন্তরে। সুরদাসের প্রার্থনার কথা স্মরণ করুন। এ দেশের কোনো সাধক গেয়েছেন :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পরে পাবিরে
প্রেম-রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজলে পাবি
হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন। ইত্যাদি

রামপ্রসাদও তাঁর মনকে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে বলেছেন। কবি মিল্টন অন্ধাবস্থায় বলেছিলেন—ভগবান আমার বাইরের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি আমার অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। 'প্যারাডাইস লষ্ট' নামক মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে যেখানে কবি স্বর্গের বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেখানে স্বর্গের দীপ্যমান আলোর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, আমার অন্তরে চক্ষু স্থাপন করো, সেখান থেকে সকল তম বিদূরিত করো, যাতে আমি মানবচক্ষুর অদৃশ্য বস্তুসকল দেখতে ও বর্ণনা করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা জন্মান্ধ রজনীও একদিন বলেছিলেন—'দেখ মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি'।

কিন্তু মনে হয় 'এহো বাহ্য আগে আছে আর'। মিল্টন অধ্যাত্ম দৃষ্টির কথা বললেও সত্যিকার তত্ত্বদর্শী ছিলেন কিনা, বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমাদের দেশে কবি কথার একটি মানেই হচ্ছে জ্ঞানী, ক্রান্তদর্শী। উপনিষদে

(শ্রীমদ্ভবদ্গীতাও একখানি উপনিষৎ) তাই পরব্রহ্মকে বলা হয়েছে কবি। এইজন্য যাঁর তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয় নি, তিনি কবিই নন। প্রজ্ঞা-নেত্র উন্মীলিত হয়েছিল বলেই তো বাল্মীকি, বেদব্যাস ও কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি (কালিদাস যে ভোগ-সর্ব্বস্বতার কবি নন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে' সেকথা প্রতিপন্ন করেছেন।) বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের সম্পর্কে কবি বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গলে' বলেছেন :

'কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'

আজ মর্তে আবির্ভূতা হয়েছেন, তাঁরই দৈবী প্রেরণায় সহসা বাল্মীকির শোক শ্লোকরূপে উৎসারিত হয়েছে, তিনি 'বাগাত্মক ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হয়েছেন'। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দে' 'বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্তছন্দোবাণবিদ্ধ' বাল্মীকি এক দৈবী প্রেরণার বশে নারদকে বলছেন :

'দেবতার স্তব-গীতে
দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি
মানুষেরে মোর ছন্দে-গানে'।

সত্যি, কাব্যসৃষ্টির মুহূর্ত হচ্ছে ধ্যানের মুহূর্ত, সে মুহূর্তে কবি নিখিল বিশ্বের আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যান। যে মুহূর্তে বিশ্বের রহস্য বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রতিভাত হয়, সে মুহূর্তে বিজ্ঞানীও যোগী হয়ে যান। সংসারে সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে দিব্যদৃষ্টি, এই দিব্যদৃষ্টি না থাকলে কেউ বিশ্বের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারে না।

'দর্শন ও বিজ্ঞান' এই কথা দুটো ভারতবর্ষের অদ্ভুত আবিষ্কার। আমরা অবশ্য দর্শন ও Pholosophy-এবং বিজ্ঞান ও Science এই কথা দুটো একার্থক মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক কী তাই? 'দর্শন' কথাটার মানে হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সত্যের সাক্ষাৎকার, অপরোক্ষ অনুভূতি (direct perception) আর

বিজ্ঞান মানে হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বকে বা সত্যকে বিশেষরূপে জানা। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্কটা প্রমাণ-সাপেক্ষ, আমাদের দেশে তেমন নয়। আমাদের দেশে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকেই ছ'টি আস্তিক দর্শন ও তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন (চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন) জন্মলাভ করেছে। আবার ভারতীয় মনীষা এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর সমন্বয়-স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক পার্থক্যের উপরেই ভারতের অধিকারবাদ প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই ভারতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এই জন্যেই আমাদের দেশে উপাসক-সম্প্রদায়ের এত বৈচিত্র্য। প্রতিকূলভাবেও যে ভগবানের ভজনা করা যায়, এমন দুঃসাহসের কথা ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশ উচ্চারণ করতে সাহসী হয় নি। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে নিখিল জগতের নিয়ন্তা যিনি, তিনি সাধকের দৃষ্টি-ভেদে সাকারও বটেন, আবার নিরাকারও বটেন। আবার জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর দৃষ্টিতে যিনি পরমাত্মা, ভক্তের দৃষ্টিতে তিনিই ভগবান্। বাস্তবিক, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যদি মানুষ মেনে নিতো তবে সংসারে অনেক বিরোধের অবসান হোতো, মতের পার্থক্যের ফলে মনের পার্থক্য ঘটতো না, ধর্মান্ধতা চিরতরে তিরোহিত হোতো, আর রাজনীতিক্ষেত্রেও পৃথিবী বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হোতো না।

সংসারে হয়তো এমন কোনো সমস্যা নেই, যা বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করা না যায়। দার্শনিক ক্যাণ্ট তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের Transcendental Dialectic অধ্যায়ে দেখিয়েছেন,—একই যুক্তির বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, ও মানুষের ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা প্রমাণিত ও খণ্ডিত করা যায়। ভগবানের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বোধ হয় আলাদা, কেননা, মানবের দৃষ্টি দেশ-কালের দ্বারা খণ্ডিত আর তাঁর দৃষ্টি অখণ্ড। আমরা বিধাতাকে মঙ্গলময় বলে থাকি, কিন্তু একথা কখনো ভাবিনে যে, আমরা আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে যাকে শ্রেয় বলে মনে করি, সেটা তাঁর সূক্ষ্মতম বিচারে আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নাও হোতে পারে। অথবা এমনও হোতে পারে যে, তাঁর কাছে মঙ্গল ও অমঙ্গল বলে কোনো বস্তুই নেই।

এইজন্যেই যথার্থ ভক্ত কখনো একথা বলেন না, 'আমার মঙ্গল বিধান করো, প্রভো', তিনি সর্বদা প্রার্থনা করেন—'তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে'।

বলেছি, মানুষে-মানুষে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মেনে নিলে সংসারে অনেক আপদ চুকে যায়। আমরা তখন অপরের মতকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দিতে শিখি। পরমত-সহিষ্ণুতা মানব-চরিত্রের একটি নিকৃষ্ট গুণ, অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা এবং তার ভিতর যে সত্যটুকু আছে, তাকে স্বীকৃতি দান করা, এটাই হচ্ছে বড়ো কথা। অপরের মতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার মতো ঔদার্য লর্ড এস্‌কুইথ্‌-এর ছিল। তাই তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য ছিল সকলের স্পৃহণীয়। ভারতবর্ষ এই দৃষ্টির পার্থক্য মেনে নিয়েছে, তাই সে মানুষকে দিয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ভারত মানুষকে দিয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, আর য়ুরোপ দিয়েছে কর্মের স্বাধীনতা। এ যুগের য়ুরোপ মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখনো পাশ্চাত্ত্য দেশে সর্বত্র, সকল অবস্থায় স্বাধীনতার আদর্শ সম্পূর্ণ মর্য্যাদা পায়নি। বাস্তবিক, মানুষের দৃষ্টি যেখানে সঙ্কীর্ণ, সেখানেই দেখা দেয় মানবের কণ্ঠরোধের প্রয়াস। সত্যই আপেক্ষিক। আমরা মায়িক জগতে বাস করি, যেখানে দুটো মত পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও দুটোই খণ্ডিত সত্য। শোনা যায়, কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি এক সময়ে হস্তিদেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করে হস্তিসম্পর্কে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমাদের অবস্থাও সেই অন্ধদের মতো। ভারতের ঋষিরাই তো জ্যোতির্ময় পূষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, হে পূষন্, তুমি তার আবরণ উন্মোচন করে দাও, যেন সত্যধর্মকে দর্শন করতে পারি।' আমরা কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নিজেরা অন্ধ হয়েও অপর অন্ধকে পথ দেখাবার বৃথা চেষ্টা পাচ্ছি। তাই আমাদের দুর্গতির আর অন্ত নেই। যদি অন্ধের সঙ্গে অন্ধের মিলন না ঘটে পঙ্গুও অন্ধের মিলন ঘটতো, তা' হলে হয়তো উভয়েই নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পারতো।

বিড়াল-ছানা অন্ধ হয়ে জন্মায়, কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রাকৃতিক নিয়মেই তার চোখ ফোটে। মানব-শিশু চক্ষুষ্মান হয়ে জন্মায়, কিন্তু তার অন্তশ্চক্ষু স্বাভাবিক নিয়মে উন্মীলিত হয় না, সেজন্যে চাই কঠোর সাধনা, উগ্র তপস্যা। যুগে যুগে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন অজ্ঞানান্ধ মানুষকে দৃষ্টি দান করতে। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে'। সহস্র মানুষের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভের জন্যে যত্ন করে। এর কারণ হচ্ছে,— আমরা যে অন্ধ, সে অনুভূতিও আমাদের নেই। তাই, আমরা সংসারের ঘানিতে অনবরত ঘুরছি আর সুখ-দুঃখের চক্রে আবর্তিত হচ্ছি। আমাদের মস্তকোপরি যখন খড়্গ উদ্যত, তখন মধুপানের জন্যে লালায়িত হচ্ছি। সাধক রামপ্রসাদ এই সত্য উপলব্ধি করে একদিন গেয়েছিলেন:

'মা, আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত,
ভবের গাছে বেঁধে রেখে মা
পাক দিতেছ অবিরত,
এবার খুলে দাও মা চোখের ঠুলি
হেরি মা তোর অভয় পদ'।

সত্যি, মা যদি দয়া করে চোখের ঠুলি খুলে না দেন, তা' হলে তাঁর অভয় পদ দেখা যায় না, আবার তাঁর অভয় পদ না দেখলেও শোক, ভয় ও মৃত্যুর হাত থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মা আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে দূরে সরে যান, আমরা বুঝতে পারি নে যে, আমাদের চোখে ঠুলি রয়েছে, কেননা ঠুলির ভিতর দিয়ে যে জগৎ-প্রপঞ্চ দেখা যায়, তা' সত্যিই মনোহর, তাই আমরা ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকিনে, মাও আমাদের দেখা দেন না। যখন সংসারের শোক-তাপে জর্জর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে ওঠে, তখন মুহূর্তের জন্যে মা আমাদের কাছে এসে আমাদের কোলে নেন, আমরাও তখন মুহূর্তের জন্যে যেন নির্ভয় হয়ে যাই, কিন্তু আবার আমরা মোহ-গর্তে পতিত হই। একেই সাধকেরা বলে থাকেন, মায়ার খেলা বা মায়ের খেলা। এ

খেলারও একটা প্রয়োজন আছে, কেননা, এ খেলা যদি না থাকতো, তা হ'লে সংসার যে বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

মায়া যে দুরতিক্রম্যা, সে কথা তো সাধক রামপ্রসাদও স্বীকার করেছেন। তিনি গেয়েছেনঃ 'ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ী কিসে কাটি'? কিন্তু বারে বারে মোহগর্তে পতিত হয়ে শোক-তাপে জর্জর হয়ে যেদিন আমাদের হৃদয় এমন একটি পরম আশ্রয় খুঁজবে, যে আশ্রয় পেলে মানুষ নিত্যকাল আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে, সে দিন রামপ্রসাদের মতো আমরাও গেয়ে উঠবোঃ

'এবার খুলে দাও মা চোখের ঠুলি
হেরি শ্রীপদ মনের মত'।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বমৈত্রী

সাগরে যেমন নানা নদ-নদীর জলধারা আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই যাঁহারা লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহাদের মধ্যে নানা দেশের নানা যুগের বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত-মুখী ভাবধারা আসিয়া মিলিত হয়। বাংলা ভাষায় যাহাকে বলে আতস কাচ, সংস্কৃতে বলে অয়স্কান্ত ও ইংরেজিতে বলে Convex Lens, তাহার মধ্যে যখন সূর্য্যের রশ্মিসমূহ সংহত হয়, তখন সহসা আমরা দীপ্যমান বহ্নিকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বিধাতার নির্দেশে, যুগ-প্রয়োজনে পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে যেসকল ক্ষণজন্মা মহামনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাদের চিত্তও আতস কাচের মত, অসংখ্য মনীষীর খণ্ড চিন্তাধারা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া এক সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে, তাই আমাদের নিকট তাঁহারা অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান হন,—তাঁহারা শুধু নিজেরা দীপ্তিমান হন না, অপরকেও দীপ্তিমান করিয়া তোলেন। যাঁহারা তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাঁহারা আপন আত্মার মহিমা সম্পর্কে সচেতন হন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত যে শক্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকটিত হইয়া সকলের মনে বিস্ময় জাগায়।

যাঁহাদিগকে আমরা যুগ-মানব বা Representative Men বলি, তাঁহারা সর্ব্বদাই যুগের অগ্রগামী, তথাপি তাঁহারা যুগের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা যুগাতিগ হইয়াও যুগানুগ এবং যুগানুগ হইয়াও যুগাতিগ। (They are the makers of the age and at the same time they are the products of the age) আর শুধু যুগের প্রভাব নয়, একটা দেশের বহুযুগসাঞ্চত সংস্কৃতির ধারাও তাঁহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনেও এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে বিগত শতাব্দীতে যে ভাব-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তবে তাঁহার সত্য-দিদৃক্ষু মন অন্ধভাবে কাহারও বশ্যতা স্বীকার না

করিয়া বা পুঁথিগত বিদ্যায় তৃপ্তি লাভ না করিয়া সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতির জন্য লালায়িত হইয়াছিল। তারপর বিধাতার মঙ্গলময় নির্দ্দেশে একদিন জিজ্ঞাসু বিবেকানন্দ সংশয়াকুল চিত্তে তার্কিকী বুদ্ধি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন,—যিনি লৌকিক দৃষ্টিতে নিরক্ষর হইয়াও সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, যাঁহার ধ্যানে বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হইয়াছিল এবং যিনি জগদম্বার চরণে শুদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়াই দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অমৃতময় ফল লাভ করিয়াছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম' যিনি বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর লক্ষ্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের কৃপায়ই নরেন্দ্রনাথের সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইল, তাঁহার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইল। তিনি উপলব্ধি করিলেন,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় সভ্যতার মধ্যেই কল্যাণের আদর্শ নিহিত আছে, অথচ প্রত্যেক জাতির কর্ম্মে ও চিন্তায় এমন এক স্বাতন্ত্র্য আছে যাহাতে সে অপরাপর জাতি হইতে পৃথক। পৃথিবীতে কোন জাতিই যে পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বা স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না, আবার সঙ্কীর্ণতা বা কূপমণ্ডূকতা অবলম্বন করিয়া জগতের অগ্রগতিকে অস্বীকার করিলেও জাতির মৃত্যু যে কালক্রমে অনিবার্য্য হইয়া উঠে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাও প্রজ্ঞানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনের প্রয়াস পান নাই,—রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যলাভের ফলে তাঁহার অন্তরে যে আলোক দীপ্যমান হইয়াছিল, সেই আলোকেই তিনি ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে যাহা বরণীয় এবং যাহা রমণীয় কিন্তু স্পৃহণীয় নহে, তাহাও দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙ্গালী মনীষীর ন্যায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের মনেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই সকল মনীষীর মত তিনিও এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি এই সামঞ্জস্যের স্থাপয়িতা, তিনি আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত নহেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নব জন্ম লাভ

করিয়াছেন। এক হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের মিলনকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার মিলন বলা চলে। অথচ একথাও সত্য যে, তাহাদের মানসপ্রকৃতির আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে একটা মূলগত ঐক্য ছিল, যাহার ফলে পরমহংসদেব প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে যে বিশ্ব-মৈত্রীর বিকাশ ঘটিয়াছিল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই যে তাহার প্রেরণা-মূলে ছিল, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে উদগ্র স্বদেশপ্রেম ও তীব্র স্বাজাত্যাভিমানের সহিত উদার, অসাম্প্রদায়িক মানব-প্রীতির এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি যুগের প্রতিনিধি, যুগ-মানস তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীচ্যের সভ্যতা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙ্গালীর মোহ-নিদ্রা ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যুক্তির আলোকে সব কিছু যাচাই করিয়া লইবার প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে তাহার বুদ্ধি স্বল্পকালের জন্য অবসাদ-গ্রস্ত হইলেও সে যথাকালে আত্মপ্রবুদ্ধ হইয়া নিজের গৌরবময় অতীতের দিকে দৃক্‌পাত করিয়াছিল এবং মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আবার প্রতীচ্যের নিকট হইতে সে স্বদেশপ্রেম ও মানবতার নব আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি, স্বামীজির প্রকৃতিতে যেমন সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল তেমনই স্বদেশপ্রেম ও বিশ্ব-মৈত্রীর যে আদর্শ তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সে আদর্শেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বামীজির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিসত্তা ও তাঁহার জীবনে বিভিন্নমুখী ভাবধারার প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে তাঁহার স্বাজাত্য-বোধ ও মানবপ্রীতির মহিমা উপলব্ধি করা যায় না।

এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হইবে না যে, উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিন্তাধারার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের যুগ, বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মপরিচয়-লাভ ও আত্মোপলব্ধির যুগ, আর লোকোত্তর পুরুষ স্বামী

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মধ্যে ঘটিয়াছিল শতাব্দীর বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার এক মহা সমন্বয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন 'জঙ্গম হেমকল্পতরু-সদৃশ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোকে বাঙ্গালী নূতন করিয়া মানবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং প্রভাতে যেমন শত শত কমল সূর্যের করস্পর্শে বিকশিত হয়, তেমনই সহস্র সহস্র মানুষের চিত্ত একটি মাত্র মহামানবেব জীবনের ভাস্বর আলোকচ্ছটার প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক তেমনটি ঘটে নাই। এ যুগের মানুষের কর্ম্মধারা ছিল বহুমুখী, চিন্তাধারা ছিল বিচিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি স্মরণীয়—

ক] বাংলাদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়াস এবং এতদুদ্দেশ্যে কেরী প্রভৃতি মিশনরীগণের বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা।

খ] সব্যসাচী রামমোহন কর্তৃক সংস্কারান্ধ দেশীয় পণ্ডিত ও ধর্ম্মান্ধ বিদেশী পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধ ও এতদুদ্দেশ্যে পুস্তক-পুস্তিকা-প্রণয়ন।

গ] বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট রাজা রামমোহনের স্মরণীয় পত্র।

ঘ] হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, তরুণ ছাত্রগণের উপর যুক্তিবাদী ডিরোজিওর প্রভাব ও তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ।

ঙ] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্যাখ্যান—খৃষ্টীয় মিশনরিগণের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে অভিযান—হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা—শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ ও হিন্দুদিগের প্রতীকোপাসনার বিরোধিতা।

চ] দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার-গ্রহণ ও যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ।

ছ] শ্রীমধুসূদনের প্রতীচ্য দীক্ষা (কোন বাঙ্গালী মনীষী ইহাকে বলিয়াছেন

'অতলান্ত সাগরের দীক্ষা') ও হিন্দু কলেজে প্রবেশ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি মেঘনাদবধে মানবতার জয়গান, রাবণ ও মেঘনাদের উদগ্র স্বদেশপ্রেমে প্রতীচ্য প্রভাব।

জ] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যবোধের সহিত প্রতীচ্য যুক্তিবাদের সমন্বয়।

ঝ] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, কেশবের ধর্ম্মসাধনায় যুগপৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব।

ঞ] বঙ্কিমচন্দ্রের নব্য হিন্দুধর্ম্ম প্রচার, ধর্ম্মের অভিনব ব্যাখ্যা, সর্ব্ব বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষরূপে স্থাপনের প্রয়াস, উপন্যাস-ত্রয়ীতে (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, ও সীতারামে) ধর্ম্মের আদর্শ-প্রচার, গীতার ব্যাখ্যা।

ট] দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বৈচিত্র্য ও তাহার ফলে 'যত মত তত পথ' এই সত্যের উপলব্ধি, রামকৃষ্ণরূপ কমলের সৌরভে আকৃষ্ট ভৃঙ্গকুল, কেশবচন্দ্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন।

ঠ] শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন, নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণ, জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথের সংশয়-নিরসন ও তাঁহার জীবনে রূপান্তরের আরম্ভ।

ড] কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-সাধনার পরিণতি ও নব-বিধানের আদর্শস্থাপন।

ঢ] হিন্দুধর্ম্ম-সম্পর্কে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর আবেগময়ী বক্তৃতাবলী, শশধর তর্ক-চূড়ামণি কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়াস।

ণ] শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসান, নরেন্দ্রনাথের নব-জন্মলাভ ও সন্ন্যাসগ্রহণ, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত-আবিষ্কার, প্রতীচ্যে হিন্দুধর্ম্মের দিগ্বিজয়, স্বদেশে ধর্ম্ম-প্রচার, সন্ন্যাসের নূতন আদর্শস্থাপন ও বিচিত্র কর্ম্মধারা, বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের উপর বিবেকানন্দের অপরিসীম প্রভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ধর্ম্মান্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে যে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমরা সেই কয়েকটী ঘটনার ইঙ্গিত

করিলাম। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় সন-তারিখের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার নিকট শুধু ভাবগত সত্য ছিল না, ছিল উপলব্ধিগত সত্য। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের মৈত্রীভাবনা শুধু ভাবনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই, বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। স্বামীজির বিশ্বমৈত্রী ও মানব-প্রীতি যেন তাঁহার ধর্ম্মসাধনারই পরিণত ফল; এইজন্য ইহাকে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। সাধনার বলেই স্বামীজি মানবতার এক নূতন মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আর এই জন্যই তাঁহার শ্রদ্ধা-বুদ্ধি পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের লোকোত্তর জীবনকে আমরা তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম—আত্ম-আবিষ্কারের যুগ। জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া ছিন্নসংশয় হইলেন, তখন তাহার আত্মোপলব্ধি হইল, তিনি আপন আত্মার মহিমাসম্পর্কে তথা মানবাত্মার মহিমা-সম্পর্কে সচেতন হইলেন। দ্বিতীয়—ভারত-আবিষ্কারের যুগ, এই আবিষ্কারের মূলে আছে—ভারতের লাঞ্ছিত, দুর্গত, অবমানিত মানবতার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্যই পরিব্রাজক বিবেকানন্দ হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং আপন আত্মার আলোকে ভারতবাসীকে চিনিয়াছিলেন। তৃতীয়—বিশ্বরূপ-দর্শনের যুগ। ভারত-আবিষ্কারের ফলে তিনি যে উদার, সার্ব্বভৌম দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টির সাহায্যেই তিনি মানুষের বহু বিচিত্র কর্ম্মধারা ও মানব-সভ্যতার বিচিত্র-রূপ দর্শন করিয়াছেন এবং নানা জাতির অতীত ইতিহাসের মধ্যেও নিহিত অর্থ বা তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

সুতরাং স্বামীজি বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শকে শুধু তত্ত্বহিসাবেই গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত প্রেম নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল। প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল

দুর্গত মানুষের লাঞ্ছনায় অপরিসীম বেদনাবোধ, আবার এই প্রেমই তাঁহার অন্তরে সঞ্চার করিয়াছিল দুর্জ্জয় সাহস। এই অজেয় পৌরুষের প্রভাবেই স্বামীজিকে আমরা অনেকবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইতে, মানবতার অপমানে অসহিষ্ণু হইতে দেখিয়াছি। স্বামীজির মধ্যে আমরা শুধু ব্রহ্মতেজই প্রত্যক্ষ করি নাই, ক্ষাত্রবীর্য্যও দর্শন করিয়াছি আর সে বীর্য্য মূলত প্রেমের বীর্য্য।

আমরা বলিয়াছি, বিশ্বমৈত্রীর যে আদর্শ স্বামীজির জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সে আদর্শ শতাব্দীর অন্যান্য মনীষীদের প্রচারিত আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। কথাটি বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রতীচীর নিকট নব-মানব-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণের কণ্ঠে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী উদ্গীত উইয়াছিল, তাহা রামমোহনের চিন্তাধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মনীষী গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা একই মানব-সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশ। আবার, রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত, আরবী ও হিব্রু ভাষায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মূলগত ঐক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপনিষদের একটি বাণী রামমোহনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে॥

(ঈশোপনিষৎ, ৬)

যিনি সর্ব্বভূতকে নিজের আত্মায় দর্শন করেন, এবং নিজের আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

আবার পারস্য সাহিত্যের যে যে অংশে মানবতার জয়গান করা হইয়াছে, সেই সেই অংশ যে রামমোহনের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল,

তাহারও প্রমাণ আছে। তথাপি, রাজা রামমোহন প্রধানত ছিলেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহার ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, মানুষে-মানুষে কৃত্রিম বৈষম্যই পৃথিবীতে অকল্যাণের মূল। এই জন্যই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও স্বৈরাচারের বিরোধী ছিলেন। রামমোহনের ইংরেজী রচনাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রমাণ পাইয়াছেন। স্বামীজির চিন্তাধারায় যে রামমোহনের প্রভাব বিদ্যমান, ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

It was here (Nainital) too that we heard a talk on Rammohan Roy in which he (Vivekananda) pointed out three things as the dominant notes of this teacher, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussalman along with the Hindu. In all these three things he (Vivekananda) claimed himself to have taken the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out. (Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda).

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—তিনটি ব্যাপারে রাজা রামমোহনের ভবিষ্যদৃষ্টি ও ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বেদান্তকে স্বীকৃতি দান, দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার, তৃতীয়ত, বিশ্বতোমুখী প্রীতি যাহা হিন্দু-মুসলমানে সমভাবে প্রসারিত। আমি এই তিনটি বিষয়ে রামমোহনের অনুসরণ করিতেছি।

অবশ্য, রামমোহনের সঙ্গে স্বামীজির চিন্তাধারার পার্থক্যও কম গুরুতর নয়। তথাপি, স্বামীজি শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহনের স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যে রূপ দেখিতে পাই, উহার মূলে ছিল এক বিশিষ্ট প্রকারের ধ্যানধারণা।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনার শেষ পর্য্যায়—নববিধানের আদর্শ-স্থাপন। এই স্তরে আমরা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনার পরিণত ফলটি দেখিতে পাই। 'নববিধানের' প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র শুধু ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শই প্রচার করেন নাই, সাম্য ও বিশ্বমৈত্রীরও জয়গান করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ভক্ত, তাই বিচিত্ররূপে ভগবানের লীলারস আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন, পৃথিবীর অসংখ্য বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করিয়া সাম্য-স্থাপন করিতে চাহেন নাই। কেশবচন্দ্র জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

'Hear ye men, there is one music but many instruments, one body but many limbs, one spirit but diverse Gifts, one blood, yet many nations, one church yet many churches. Blessed are the peace-makers, who reconcile differences and establish peace, good will and brotherhood in the name of the Father.'

'হে মানবগণ, শ্রবণ কর, বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন, কিন্তু তাহাতে একই গান ধ্বনিত হইতেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কিন্তু দেহ এক, গুণ অনন্ত কিন্তু আত্মা অখণ্ড, জাতি বিচিত্র কিন্তু তাহাদের শিরায় একই রক্ত প্রবাহিত, ভজনালয় অসংখ্য অথচ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মমন্দির একটি মাত্র।

'ধন্য তাঁহারা যাঁহারা শান্তিস্থাপন করেন, যাঁহারা বিরোধের মধ্যে সমন্বয় বিধান করেন এবং পিতার নামে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।'

কেশবচন্দ্র বিশ্বমৈত্রীর যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, উহাতে আমরা Sermon on the Mount এর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; কিন্তু স্বামীজি বিশ্বমৈত্রীর যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, উহার দার্শনিক ভিত্তি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। আবার, কেশবচন্দ্র চাহিয়াছেন বিচিত্র ভাবে ভগবানের লীলারস আস্বাদন করিতে, আর দুর্গত মানবতার বেদনায় বিক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ চাহিয়াছেন মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে।

প্রাচীন কালে, পৃথিবীর দুই জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু—ভগবান তথাগত ও

ভগবান ঈশা—আচরণ ও প্রচারের মধ্য দিয়া বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজির জীবনে এই দুইজন লোকোত্তর পুরুষের প্রভাব অনস্বীকার্য। তথাগতের মৈত্রীভাবনা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নিখিল ভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 'সর্ব্বভূতহিতে রত' বুদ্ধদেবের হৃদয়ের বিশালতা স্বামীজিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—আমি চাই আচার্য্য শঙ্করের মনীষা ও বুদ্ধের হৃদয়। ('I want the intellect of Sankara and the heart of Buddha') ঈশার মৈত্রীভাবনা সর্ব্বভূতে প্রসারিত হইয়াছিল কিনা, সেবিষয়ে প্রমাণের অভাব কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে সর্ব্ব মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ভগবান তথাগত মানুষকে অপরিসীম মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। দেহ-রক্ষার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন—'আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর'। প্রত্যেক মানুষ যে নিজের ভাগ্যবিধাতা, এ কথাও বুদ্ধদেব উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে মানুষ নিজের উদ্ধারসাধন করে না, কোন দেবতা বা মহাপুরুষই তাহার উদ্ধার সাধন করিতে পারে না, ইহাই ছিল বুদ্ধের বাণী। তাঁহার আর একটি অনুশাসন এই—মাতা যেমন সন্তানের প্রতি অপরিসীম দয়ার ভাব পোষণ করে, তেমনই সর্ব্বদা (উঠিতে, বসিতে, খাইতে, চলিতে) নিখিল প্রাণিজগতের প্রতি অপরিমিত দয়ার ভাব পোষণ করিবে। ঈশ্বর সম্পর্কে বুদ্ধের নীরবতার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। এডুইন আর্ণল্ডের 'Light of Asia' নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা তথাগতের মুখে শুনিতে পাই—

'I would not let one cry.
Whom I could save ! How can it be that Bramha
Would make a world and keep it miserable
Since, if all powerful, he leaves it so
He is not good, and if not powerful
He is not God ?

'আমি এমন একজনকেও কাঁদিতে দিব না যাহাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি আমার রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি করিয়া ইহাকে দুঃখে পূর্ণ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও এই ধরাকে দুঃখে নিপীড়িতা রাখেন, তবে তিনি কল্যাণময় নহেন, আর যদি বলা যায়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন, তবে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যায় না!

স্বামীজি নিরীশ্বরবাদী নহেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকট উপলব্ধির বস্তু, তথাপি তিনি দুর্গত মানবতার বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—'যে ধর্ম্ম ক্ষুধার্ত্তের মুখে এক টুকরা রুটি তুলিয়া দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি না'। যে প্রেম শুধু মানুষে নয়, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গে ব্যাপ্ত হয়, সেই প্রেমকে স্বামীজি মানব-প্রীতির চেয়েও উচ্চতর স্থান দিয়াছেন, তথাপি, মানুষের বেদনাই তিনি বিশেষ ভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। যাঁহারা দুর্গত মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া পশু-পক্ষীর দুঃখ-মোচনে নিরত, তাঁহাদের কার্য্যকে তিনি ভণ্ডামি ও পাগ্‌লামি বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্' ইহাই তাঁহার অন্তরের কথা ছিল বটে, কিন্তু দুঃখতপ্ত নর-নারীর আর্ত্তিনাশনকেই তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভগবান ঈশা (Jesus Christ) ধর্ম্মান্ধ ইহুদী জাতির মধ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ইহুদীগণের ধারণা ছিল, তাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, তাই ভগবান সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে বিজয় প্রদান করিবেন। ভগবান ঈশা তাঁহাদের এই স্বাজাত্যাভিমান চূর্ণ করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—তোমার প্রতিবেশীর প্রতি আত্মবৎ প্রীতিমান হইবে। (Love thy neighbour as thyself.) এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার প্রতিবেশী যে সম্প্রদায়ভুক্ত বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাহাকে নিজের মত ভালবাসিতে হইবে। ঈশা যে আদর্শ প্রচার করিলেন, উহা মূলতঃ

মানব-প্রীতি বা বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। ইহুদী জাতির মধ্যে ঈশা প্রচার করিলেন, তোমরা প্রাচীন ধর্ম্মের নির্দেশ শুনিয়াছ, বন্ধুকে ভালবাসিবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করিবে।

Bur I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.

'কিন্তু আমার নির্দ্দেশ এই, শত্রুকেও ভালবাসিবে, যাহারা অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করে, তাহাদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে, যাহারা তোমায় ঘৃণা করে, তাহাদেরও হিতসাধন করিবে, যাহারা আচরণের মধ্য দিয়া তোমাদের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে এবং তোমাদের প্রতি নির্য্যাতন করে, তাহাদেরও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিবে।

সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ ঈশদূত ঈশার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার Christ the Messenger নামক পুস্তিকায় এই শ্রদ্ধা-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। Thomas A. Kempis বিরচিত Imitation of Christ নামক গ্রন্থখানি তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন। ভগবান ঈশা যে মানবতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, উহা স্বামীজির চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

স্বামীজি Imitation of Christ গ্রন্থখানির দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে স্বয়ং ঐ গ্রন্থের প্রথম ছয়টি অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। স্বামীজির এই অনুবাদ 'ঈশা-অনুসরণ' নামে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। (১২৯৬ বঙ্গাব্দ, ১ম ভাগ, প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা।) এই অনুবাদটি স্বামিজীর 'ভাববার কথার' সহিত সংযোজিত হইয়াছে। সূচনায় স্বামীজি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বতোমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজি লিখিয়াছেন—"সব সেয়ান্ কি একমত—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই এক প্রকার মত।

পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। * * যাহারা অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টীয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনের (?) একটি সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব—

'আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ'

সিদ্ধ পুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে টীকাকার ঋষি জৈমিনি (?) বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব"।

'ঈশা-অনুসরণের' পাদ-টীকায় স্বামীজি গ্রন্থকার এ কেম্পিসের উক্তির অনুরূপ বহু উক্তি ভাবতীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব ও ঈশার সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানব-প্রেমের কথাও স্মরণ করি। তাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র ভারতে যে মহাভাবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল, সেই প্লাবনে মানুষের রচিত শাস্ত্রের কৃত্রিম অনুশাসন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল! 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' মহাপ্রভু এই সত্যকে আচরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছিলেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', জীব অণুচৈতন্য, ভগবান বিভুচৈতন্য, সুতরাং অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের যে সম্পর্ক, জীবের সঙ্গে ভগবানের সেই সম্পর্ক। আবার, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়া, এবং অস্পৃশ্য পতিতের উদ্ধার সাধন করিয়া মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহা ছিল ভক্তিধর্ম্মের

উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রেই কৃষ্ণের দাস, তাই তিনি জীবে দয়ার আদর্শও প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামীজির বিশ্বমৈত্রীর দার্শনিক ভিত্তি ছিল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কিন্তু ইহার উৎসমুখে ছিল দুর্গত মানুষের প্রতি বেদনাবোধ।

এবার আমরা স্বামীজির বিশ্ব-মৈত্রীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিব।

আমরা বলিয়াছি, স্বামীজির জীবনে বিশ্বমৈত্রীর যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ এবং মানুষের দুর্গতিতে বেদনা-বোধ। মানুষের আত্মার মহিমায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড আর এই বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ। জীব মাত্রেই যখন স্বরূপত ব্রহ্ম, তখন মানুষে মানুষে প্রভেদ শুধু প্রকাশের তারতম্যে,—বেদান্ত হইতে এই শিক্ষাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম অদ্বৈতবাদকে ব্যবহারিক জগতে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—তাই তিনি জলদমন্দ্রে প্রচার করিয়াছিলেন, 'যে আত্মার মহিমায় বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক'। বেদান্ত আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—আমরা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-চৈতন্যস্বরূপ, আর আমরা আমাদের স্বরূপ-চিন্তনের দ্বারাই সর্ব্ববিধ ভয়ের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। স্বামীজি বলিয়াছেন, বেদান্ত আমাদের অন্তরে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে বলিয়াই বেদান্তের শিক্ষাব দ্বারা আমরা ইহ জগতেও অভ্যুদয় লাভ করিতে পারি। যাহাকে আমরা লাঞ্ছিত বা পতিত বলিয়া মনে করি, তাহার মধ্যেও ব্রহ্মই প্রকাশমান হইতেছেন, সংসারে কেউ হেয়, তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নহে, পৃথিবীর যাবতীয় নর-নারীই অমৃতের সন্তান, এই মহাসত্য স্বামীজি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই পৃথিবীর সকল জাতির মানুষকেই তিনি হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মন ছিল 'সাম্যে স্থিত', তাই তাঁহার প্রেম নিখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীজির এই মানবতাবাদ প্রতীচ্য সাহিত্য বা দর্শনের মানবতাবাদ নহে। প্রতীচীর সাহিত্যে ও দর্শনে প্রধানত মানুষ বলিয়াই মানুষের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষ অনন্ত

শক্তির অধিকারী, কেননা, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। গ্রীক ট্র্যাজিডিতে মানুষকে একান্ত ভাবেই দৈবাধীন করা হইয়াছে; 'Prometheus Bound' নামক নাটকে দেখিতে পাই, মানুষের কল্যাণকামী প্রমিথিউস মানবের দুঃখমোচনের ব্রত গ্রহণের ফলেই দেবরোষে শৃঙ্খলিত হইয়াছেন কিন্তু রোমাণ্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শেলির 'Prometheus Un-bound' এ মুক্ত, অপরাজেয়, দুর্দ্দম শক্তির অধিকারী মানবাত্মার জয়গান শুনিতে পাই। শেলিরও বহু পূর্ব্বে মধ্যযুগীয় নাট্যকার মার্লোর (Marlowe) Tamburlaine নামক নাটকে দেখিতে পাই, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী মানুষ কেমন করিয়া বিশ্বজয়ের পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে পারে। প্রতীচ্য দর্শনে আমরা মানবতার জয়গান শুনিতে পাই জার্ম্মাণ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের (Immanuel Kant) মুখে। কাণ্ট বলিয়াছেন—কোন মানুষকে তোমার স্বার্থসিদ্ধি বা উদ্দেশ্য-সাধনের যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিও না বা নিজেকে অপরের হস্তের যন্ত্রে পর্যবসিত হইতে দিও না, কেননা, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই 'ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য' রহিয়াছে।

'Always treat humanity, both in thine own person as well as in the persons of others, always as an end, never merely as a means.

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত মানুষের উপাসনাকে আদর্শ হিসাবে স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক অনেক বাঙ্গালী মনীষীর চিন্তাধারার উপর কোঁতের প্রভাব ছিল বিপুল। শতাব্দীর অন্যতম মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ এমন কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কোঁতেরই Collective Humanity বা মানব-সমষ্টি। ('নিভৃত চিন্তায়' 'বিরাট পুরুষ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রতীচ্যের Humanism বা মানবতাবাদ হইতে স্বামীজির মানবতাবাদকে পৃথক করিবার জন্য আমরা বলিতে পারি, স্বামীজির Humanism প্রকৃতপক্ষে মানব-ব্রহ্মবাদ।

বাইবেল বলিয়াছেন, Man is made in the image of God আর স্বামীজি বলিয়াছেন Every man is potential Brahman.

স্বামীজির বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ শুধু জ্ঞানাত্মক নয়, কর্ম্মাত্মকও বটে। তিনি যে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম সর্ব্ব মানবে, বিশেষত দুর্গত মানবের প্রতি প্রসারিত হইয়াছিল। মনের ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কাঙ্গালীদের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন, মাথার চুল দিয়া অশুদ্ধ স্থান মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। তথাকথিত 'অশূদ্রযাজী' বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও উপনয়ন-কালে ধনী কামারণীকে ভিক্ষামাতা করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়েই প্রয়োজন-বোধে লোকাচারকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে 'জীবে দয়া'র আদর্শ বহুকাল হয় প্রচলিত,—'নামে রুচি', 'জীবে দয়া', ও 'বৈষ্ণব-সেবন' গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও সার কথা। কিন্তু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে কেহ কাহাকেও দয়া করিবার অধিকারী নহে, তাহা ছাড়া, 'আমি দয়া করিতেছি' এই বোধ হইতে দানকর্ত্তার মনে অভিমানের সঞ্চার হওয়াও স্বাভাবিক। তাই প্রেমিক সন্ন্যাসী শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ প্রচার করিলেন, জীবের প্রতি প্রেমই যে ঈশ্বরের যথার্থ আরাধনা, ইহাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

তাই, স্বামীজি 'আপনি আচরি' দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন। তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

'দয়া নহে,—সেবা, সহানুভূতি নহে—প্রেম, সর্ব্বজীবে আত্মানুভূতি।

'আমি যেন সহস্রবার জন্মগ্রহণ করি আর সহস্রবার যেন দরিদ্ররূপী,

দুষ্টরূপী, দুঃখীরূপী নারায়ণের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার সাধনার ভিত্তি'।

দুঃখের সহিত স্বামীজির পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। দুর্গতের অপমানকে তিনি নিজের অপমান বলিয়াই মনে করিতেন। অন্ত্যজের গৃহে তিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের বেদনায় তিনি যেমন ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই তাহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম সম্পদ আবিষ্কার করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রোমা রলাঁ তাই লিখিয়াছেন—

'Everywhere he shared the privations and the insults of the oppressed classes. In central India he lived with a family of outcast sweepers. Amid such lowly people who cower at the feet of society, he found spiritual treasures while their misery choked him'

এই জন্যই স্বীয় জীবনের আচরণের দ্বারা তিনি অস্পৃশ্যতারূপ পাপকে দূরীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। আর এইজন্যই তিনি ইহার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী, তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তিনি লিখিয়াছেন, মধ্যযুগের য়ুরোপে কর্ম্মের স্বাধীনতা ছিল, চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না, আবার ভারতবর্ষে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, কর্ম্মের স্বাধীনতা ছিল না। সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ভিন্ন যে মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নহে, এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

স্বামীজি আপন দিব্যদৃষ্টিবলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'বর্ত্তমান ভারতে' তিনি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ যথাক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। অনাগত যুগে শূদ্রজাতি (বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত) যে প্রাধান্য লাভ করিবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। উল্লিখিত পুস্তকের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—

'ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই'।

স্বামীজির এই সকল উক্তির মধ্যে আমরা একই সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইতেছি। 'নূতন ভারত বেরুক' প্রভৃতি বহুল-উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যেও দুর্গত মানবতার প্রতি বেদনাই যেন জ্বালাময়ী ভাষায় উৎসারিত হইতেছে।

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমৈত্রীর যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আদর্শ হইতে আমরা পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সমগ্র জগৎও আজ দিশাহারা। অর্থ-নৈতিক সাম্যের প্রয়োজন আছে, মানি, তথাপি, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, অধ্যাত্মদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদই নিখিল জগতের পক্ষে সঞ্জীবনৌষধি। ভারতে ধনগত কৃত্রিম বৈষম্য তো আছেই, তদুপরি আছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও প্রাদেশিকতা এই দুইটি গুরুতর ব্যাধি। (আমরা এ ব্যাধির মূল অন্বেষণ করিয়াছি, নিদানও আবিষ্কার করিয়াছি কিন্তু চিকিৎসার উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।) এদিকে প্রতীচ্য জগৎ পরস্পর বিবদমান দুইটি শিবিরে বিভক্ত, বিশ্বের মনীষিগণ তৃতীয় মহাসমরের আশঙ্কায় ভীত, তাই তাঁহারা অনেকেই 'peaceful co-existence' বা শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের নীতি-প্রচারে ব্যগ্র। স্বামীজি একদিন বলিয়াছিলেন—'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এক আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত', তাঁহার এই উক্তি আজ প্রায় সকল মনীষীরই স্বীকৃত। আজ বাংলাকে তথা ভারতকে শ্রেয়ের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য, এবং জগৎকে ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, বিবেকানন্দের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। তাই কবির ভাষায় বলি—

'Swamiji ! Thou shouldst be living at this hour
Bengal hath need of thee.'

আবার বলি, শুধু বাংলা নয়—
'India hath need of thee'
পরিশেষে বলি, শুধু ভারতও নয়—
'The world hath need of thee.'

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিভাবান তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় না হইত এবং তিনি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া নবজন্ম লাভ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, ক্ষাত্রশক্তিধর দিগ্বিজয়ী বীরসন্ন্যাসীকে পাইতাম না, কিন্তু হয়তো তিনি নব নব ঐশ্বর্যে বঙ্গবাণীকে অধিকতর সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, এক দিকে সাহিত্য ও অপর দিকে চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিত কলার প্রতি অনুরাগ নরেন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার বাংলা রচনাবলী আয়তনে অল্প হইলেও উহার মধ্য দিয়াই তাঁহার শব্দচয়ন-কৌশল ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামীজির পক্ষে সাহিত্য-সাধনা শুধু কল্পনাবিলাস ছিল না, তিনি স্বয়ংও হয়তো কলাকৈবল্যবাদে (Art for art's sake) বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহার রচনাবলীর উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-হিতৈষণা। তাঁহার কর্মবহুল স্বল্প-পরিসর জীবনে সচেতন-ভাবে শিল্পসৃষ্টির অবকাশ ঘটে নাই, তথাপি তাঁহার বাংলা রচনাবলীতে— তাঁহার 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' ও 'ভাববার কথা'য়, এমন কি, কবিতা ও পত্রাবলীতে তাঁহার মহিমময় ব্যক্তিত্বের ছাপটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' অনলস, অতন্দ্রিত ভাবে কর্মের সাধনা করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও ছিল সেই কর্মসাধনারই অন্তর্গত। তিনি যখন বাংলা ভাষায় নিবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা বঙ্গবাণীকে নব-নব ঐশ্বর্যে মহিমময়ী করিয়া তুলিয়াছে, বাংলার কাব্য-সাহিত্যকুঞ্জ হইতে যুগস্রষ্টা মধুসূদনের তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় হেম-নবীনের কবিতায় তাঁহাদের নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া এই কবি-যুগলকে হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তথাপি

স্বামী বিবেকানন্দ গদ্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পথ-চিহ্ন অনুসরণ করেন নাই, তিনি সর্বত্রই বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে—স্টাইল ও ডিক্‌শনে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

স্বামীজিই সর্বপ্রথম কথ্যভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার পথ-প্রদর্শক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন', ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু বিচ্ছিন্ন কথোপকথন এবং উপন্যাস বা নক্সাজাতীয় রচনা ভিন্ন নানারূপ তথ্য বা তত্ত্বমূলক রচনায়ও যে চলতি ভাষার ব্যবহার করা যাইতে পারে, স্বামীজির 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' ও 'ভাববার কথা'র অংশবিশেষে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, মনীষী প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'ই চলতি ভাষায় প্রবন্ধরচনার পথপ্রদর্শক, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, বীরবলী রচনা-রীতি ছিল স্বামীজির রচনারীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বামীজি এক দিকে যেমন কথ্যভাষায় তথ্যমূলক বা তত্ত্বমূলক নিবন্ধ-রচনার পথপ্রদর্শক, অপর দিকে তেমনই স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত অনাবশ্যক-শব্দবর্জিত গাঢ়বন্ধ রচনারও প্রবর্তক। প্রথম শ্রেণীর রচনার নিদর্শন 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নিদর্শন 'বর্তমান ভারত'।

বাংলার কথ্যভাষায় যে অফুরন্ত শব্দসম্পদ রহিয়াছে, উহাদের ভাব-প্রকাশের শক্তি সম্পর্কে স্বামীজি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে দিকে ফেরাও, সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার

যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।" (১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে লিখিত।)

'পরিব্রাজকে' স্বামীজি বাংলা ভাষার বহু চলতি বুলি ও প্রবচন প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—হালে পানি পাওয়া, কিস্তি বানচাল, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, ওছলপাছল, টালমাটাল, গদাইলস্করী চাল প্রভৃতি।

স্বামীজি চলতি ভাষার স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করিয়া উহাকে ওজস্বিনী ও প্রাণবেগে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। 'পরিব্রাজকে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশের মধ্য দিয়া আমরা যেন স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি—

"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর আর যতই কেন তোমরা ডম্‌ম্‌ম্ বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের চলমান শ্মশান বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা।...এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল, লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখচি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্বপ্ন! ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী করচ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-কুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—

তাই পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি, ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।"

স্বামীজির রচনা অনেক স্থলে হাস্যরসের দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে যে জাতীয় ব্যঙ্গরচনাকে স্যাটায়ার বলে, সেই ধরনের রচনার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় 'ভাববার কথা'য়। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে লোকাচার ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে, আমরা শাস্ত্রের নির্দেশ বা অনুশাসন মানিয়া চলি না, কিন্তু লোকাচারের মর্য্যাদা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট। স্বামীজি আমাদের এই প্রবৃত্তিকে তীব্র কশাঘাত করিয়া আমাদের সুবুদ্ধির উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হোল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, এক শত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙ্গওয়ালা মূর্তি খাড়া,

সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে, আর ঐ যে বেদবেদান্ত, দর্শন, পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখচ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো—এঁর নাম লোকাচার।"

স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' 'পরিব্রাজকে'র মতই চলিত ভাষায় লিখিত কিন্তু এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে—যেখানে স্বামীজি ভারতের বাহ্যছবি অঙ্কিত করিয়াছেন বা প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের এবং পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কে প্রাচ্যের মনোভাবের কথা বলিতেছেন সেখানে- রচনারীতি 'বর্ত্তমান ভারতে'র রচনা-রীতির অনুরূপ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই অংশে স্বামীজি 'গৌড়ী রীতি'র অনুসরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সর্বত্রই স্বামীজির নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যেখানেই তিনি কোনও অকল্যাণের আদর্শ দেখিয়াছেন, সেখানেই তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' বাংলা-সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি। ইহাতে এক দিকে যেমন স্বামীজির অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব বিশ্লেষণশক্তি ও দিব্য দৃষ্টির পরিচয় আছে, অপর দিকে তেমনি এক বিশিষ্ট রচনারীতির নিদর্শন আছে। বাংলা ভাষায় যথাসম্ভব অনাবশ্যক শব্দ বর্জন করিয়া কত স্বল্প কথায় বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করা যায়, স্বামীজি 'বর্তমান ভারতে' তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে কোন প্রাক্তন মনীষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই; নূতন পথে বিচরণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, এরূপ স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত গাঢ়বন্ধ রচনা অনভ্যস্ত পাঠকের নিকট কিছু কঠিন বা দুর্বোধ বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি ইহা যে কাব্যগুণবর্জিত নয়, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি ভারবি

অর্থ-গৌরবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন. তাঁহার বাক্যকে নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ("নারিকেলফলসম্মিতং ভারবের্বচঃ"।) নারিকেলের কাঠিন্যই উহার যথার্থ পরিচয় নয়, সেই কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করিতে পারিলে যেমন স্নিগ্ধ পানীয় ও স্বাদু অথচ বলপ্রদ শস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনই ভারবির কাব্যে দুর্বোধ্য ভাষার আবরণ ভেদ করিতে পারিলে রসবস্তুর সন্ধান মিলে। 'বর্তমান ভারতে'র ভাষা সম্পর্কেও অনেকটা এই ধরনের মন্তব্য করা চলে।

'বর্তমান ভারতে'র প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ যথাক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। নানা দেশের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়া স্বামীজি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, বৈদিক ঋষির আধিপত্যলোপের পরে এ দেশে ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থান। এই ক্ষাত্রশক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন, আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি।"

'বর্তমান ভারতে'র ভাষা সম্পর্কে দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, প্রথম—সমাসবদ্ধ পদের ভূরি-প্রয়োগ, দ্বিতীয়ত—যথাসম্ভব ক্রিয়াপদের বিলোপ। যেখানে স্বল্পকথায় অথচ অসন্দিগ্ধ ভাষায়, অনেকটা সূত্রাকারে, বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে হয়, সেখানে সমাসের আশ্রয় গ্রহণ এবং অনাবশ্যক শব্দের বর্জন করিতেই হইবে। সকল দেশের মানুষই মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোথাও পদ্য বা কবিতা, কোথাও বা গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সূত্রাকারেও যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করা যায়, ইহা শুধু ভারতবাসীরাই

জানিতেন। তাই আমাদের দেশে শুধু ব্যাকরণ নহে, ষড়দর্শনও সূত্রাকারে গ্রথিত। কিন্তু দেবভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সূত্ররচনা করা হয়তো সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে প্রয়াস না করিয়া স্বামীজি কতকটা সূত্রলক্ষণাক্রান্ত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভারতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—

"যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাড্কুলও কম্পমান, সংসার-সমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

"অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারত-জয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাড্গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

এখানে স্বামীজি শুধু সযত্নে শব্দের মাল্য গ্রথিত করেন নাই, ভাষার মধ্যে একটা দুর্দম গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছেন। স্বামীজির মধ্যে যে একটা বজ্রবিদ্যুন্ময় পুরুষসত্তা ছিল, ভাষা যেন এখানে তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু এই পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে তিনি প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত বাঙালীর জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংঘর্ষের কথা বলিয়াছেন। এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সেই দিগ্বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে:—"একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন, শত সূর্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা, অপর দিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত

যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপর দিকে এই মহা কোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বপুরুষদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপর দিকে আর্য্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার রচিত কবিতার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। স্বামীজির রচিত সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতাবলী 'বীরবাণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি সকলেরই বিশেষ পরিচিত। তাঁহার ইংরেজী কবিতার মধ্যে 'Song of the Sanyasin' (ও উহার অনুবাদ) এবং 'Kali the Mother' (ও উহার অনুবাদ "মৃত্যুরূপা মাতা", কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতাটির অনুবাদ করেন) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বামীজির বাংলা কবিতাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। তাঁহার রচিত "সৃষ্টি", "প্রলয় বা গভীর সমাধি" এবং "গাই গীত শুনাতে তোমায়"—এই তিনটি কবিতায় কাব্যরসের চেয়ে তত্ত্ববস্তুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, স্বামীজির সাধনালব্ধ অনুভূতিই এই তিনটি কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দুইটি কবিতা কাব্যগুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—"সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা"।

"সখার প্রতি" কবিতাটিকে এক হিসাবে স্বামীজির আত্মচরিত বা 'জীবন-দর্শন' বলা চলে। এই কবিতায় যে দুঃখের সুর ধ্বনিত হইতেছে, উহা পাশ্চাত্য দার্শনিক বা কবির দুঃখবাদ নহে, উহার মূলে রহিয়াছে ভারতীয় জীবনদৃষ্টি। স্বামীজি বলিতেছেন—

"বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্ব্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অহ হায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?"

ইহা স্বামীজির আত্ম-বিশ্লেষণ। আর এই আত্ম-বিশ্লেষণের ফলেই তিনি বুঝিতে পারিলেন—

"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।"

তবে নিষ্ক্রিয়তাই কি মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ ? তাহাও নহে। পরার্থে আত্মত্যাগ, জীবে প্রেম—ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বামীজি বলেন—

"ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম,—অগ্নিশিক্ষা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।"

"নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতায় স্বামীজির জীবন-দর্শন অপূর্ব্ব কবিত্বময় ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কবিতাটিতে ললিত-মধুর ও রূঢ়-কঠোর ভাবরাশি পাশাপাশি স্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী শুধু "গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবরের"ই উপাসনা করে নাই ; সে মৃত্যুরূপা কালীরও আরাধনা করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী দীর্ঘকাল ললিত-মধুর ভাবের অতিমাত্রায় অনুশীলন

করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সে যথার্থই ক্লৈব্যকে আশ্রয় করিয়াছে। তাই স্বামীজি বলেন—

"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী"॥

যথার্থ শক্তিসাধনার আদর্শ হইতে আজ আমরা ভ্রষ্ট, তাই আমরা দুঃখদৈন্যে সহজে বিচলিত হই, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমাদের অভিভূত করে, বাধা-বিঘ্ন আমাদের চলার পথকে রুদ্ধ করে। স্বামীজি আমাদিগকে বীর্য্যের সাধনায়, মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

স্বামীজির গদ্য-রচনার মত কবিতারও স্থানে স্থানে স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—

"পুত্রতরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে, প্রেমের প্রেরণ!!"

ইহার তাৎপর্য্য এই, পুত্রের প্রতি স্নেহবশত মাতা অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, আবার মাতা-পিতা বা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়াই দস্যু পরস্ব-অপহরণ করে। এরূপ স্থলে বাক্য স্বভাবতই পাঠকের পক্ষে একটু দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ প্রকাশভঙ্গি সমালোচকের দৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কখনও কখনও ইহা কাব্যগুণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশের জন্য স্বামীজিকে কখনও কখনও এমন দুই-একটি

বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, যাহার অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। এই জন্য 'বীরবাণী'র পাদটীকায় সেই সমস্ত পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন— প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (ক্রন্দনই যাহার অস্তিত্বের সাক্ষী বা প্রমাণ), স্বরময় পতত্রিনিচয় (পক্ষিসমূহ যেন কাকলীর সমষ্টি, তুলনীয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ—

O Cuckoo! shall I call thee bird
Or but a wandering voice?)

এরূপ শব্দপ্রয়োগে যে মুন্সীয়ানা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বামীজির বাংলা রচনাবলী পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, তাঁহার মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা ছিল ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাঁহার রচনার অনেক দোষ-ত্রুটিও আবিষ্কার করিতে পারেন। তথাপি এ কথা সত্য যে, তিনি যথার্থ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহার বিচিত্র দানে বঙ্গবাণীকে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাঁহার সাহিত্যকৃতি উপযুক্ত মর্যাদা বা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।

নেতাজীর ভারত-আবিষ্কার

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'নেতা কখনও তৈরী হয় না, নেতা জন্মায়।' (Leaders are born, not made) অন্য কথায় বলিতে গেলে নেতৃত্ব-শক্তিও কবি-প্রতিভার ন্যায় একটি দৈবী সম্পদ, তবে অভ্যাস বা নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা কবিত্ব-শক্তির ন্যায় নেতৃত্ব-শক্তিরও বিকাশ ঘটিয়া থাকে। আবার শাস্ত্রে যাহাকে বলা হয় নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, তাহা যথার্থ অধিনায়কের লক্ষণও বটে। কবি কাব্যলোক সৃষ্টি করিয়া শুধু মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসাই চরিতার্থ করেন না, তাহাকে পরম কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করেন আর অধিনেতা দুর্গম, তমসাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ পথের মধ্যে দিয়া জাতিকে কল্যাণের পথে লইয়া যান। দুস্তর পথের যাত্রীদিগের নিকট তিনি আলোকবর্ত্তিকা-স্বরূপ। অলঙ্ঘ্য সাগর উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে তিনি তরণিস্বরূপ। উত্তুঙ্গ লক্ষ্য-স্থলে পৌছিবার পক্ষে তিনি সোপানমঞ্চ-স্বরূপ। শুধু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বা অপরাজেয় ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হইলেই যথার্থ অধিনায়ক হওয়া যায় না, যথার্থ নেতা হইতে হইলে চাই—তীক্ষ্ণ কুশাগ্রীয় বুদ্ধি, বিপুল কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন-প্রতিভা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও নিজের কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, দেশের দুর্গত জনগণের প্রতি গভীর সম-বেদনা এবং বেদনার্ত্ত, শোষিত বা বঞ্চিত নরনারীর দুঃখমোচনের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখবরণের প্রবৃত্তি। আর কি চাই? চাই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাস কখনও নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করে না, বিরুদ্ধ মতবাদের সঙ্গে 'আপোষ' বা 'রফা' করিতে প্রবৃত্ত হয় না, সহস্র প্রতিকূলতায় অবসন্ন হয় না, সহস্র আঘাতেও ভাঙ্গিয়া পড়ে না। আমাদের নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 'সিংহকে কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে নাই, সে আপন বিক্রমের প্রভাবেই বনানীর পশুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে। সিংহের আর একটি গুণ—প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।

'একোঽহম্ অসহায়োঽহম্ ক্ষীণোঽহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥'

আমি একাকী, আমি অসহায়, আমি ক্ষীণ, আমি পরিচ্ছদহীন.—পশুরাজের মনে স্বপ্নেও এইরূপ চিন্তার উদয় হয় না।

বাস্তবিক, যাঁহারা পুরুষসিংহ অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে বিরাজ করে অজেয় পৌরুষ ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, তাঁহারাই 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' হইতে পারেন। কিন্তু যথার্থ নেতা ভবভূতির বর্ণিত লোকোত্তর পুরুষের মতই একদিকে বজ্রের চেয়ে কঠোর, অপর দিকে কুসুমের চেয়ে কোমল।

বাংলা দেশের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'নেতৃ-পরীক্ষা' নামক প্রবন্ধে নেতার লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যখনই কোন জাতির জীবন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয় এবং জাতি যখন আপন কর্তব্য-সম্পর্কে দিশাহারা হইয়া পড়ে, তখনই নেতার আবির্ভাবের প্রয়োজন সে অনুভব করে এবং কোনো অধিনায়কের আহ্বান-বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবার সঙ্গেই স্বভাবতই সে তাহাতে সাড়া দেয়। তাই যথার্থ নেতাকে চিনিয়া লইতে অনেক সময় তাহার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

সুভাষচন্দ্র যেন 'জনগণের অধিনায়ক' হইয়াই, একটা জাতির 'ভাগ্যবিধাতা' হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য, এ কথা সত্য নহে যে নেতৃত্ব-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁহাকে কঠোর সাধনা করিতে হয় নাই। গুরুগোবিন্দের মত তিনিও হয় তো একদিন বলিয়াছিলেন—

'চারিদিক হতে অমর-জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!'

তথাপি মানুষ সুভাষচন্দ্র যে অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তিনি লিখিয়াছেন—'আমার জীবনে এমন একটি উদ্দেশ্য আছে যাহা বিধাতা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট। আমার জীবন

বিধাতার সেই উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য, সুতরাং গতানুগতিক জীবন-যাত্রা আমার জন্য নহে।' (বন্ধুর নিকট লিখিত চিঠি।)

কিন্তু ভারতের যিনি নেতা হইবেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে ভারতকে চিনিতে হইবে, শুধু ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইলে চলিবে না,—আপন প্রজ্ঞার আলোতে ভারতের মর্ম্মের সন্ধান করিতে হইবে। ইহারই নাম 'ভারত-আবিষ্কার'। কিন্তু এ আবিষ্কার সহজসাধ্য নহে। কারণ, ভারতের ধর্ম্মসাধনা যেমন বিচিত্র, ভারতের সংস্কৃতির ধারাও তেমনই বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী, অথচ ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছে। এইজন্য, ভারতবর্ষ শুধু বিদেশী পণ্ডিতের চোখে নয়, আমাদের অনেক দেশী পণ্ডিতের চোখেও এক দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য রহস্য।

রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি ভারতের স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষগণ নিজ নিজ শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার আলোকে ভারতের অন্তরাত্মার সন্ধান করিয়াছেন, অথচ ইঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। আবার নেতাজী ভারতের যে রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে রূপটি হয়তো সমগ্র ভাবে অপরের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর এ কথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, নেতাজীর বিপুল সংগঠন-শক্তি ও বিস্ময়কর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাঁহার 'ভারত-দর্শন'। টোকিয়ো বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি মহাজাতি গঠন করাই আমার জীবনের ব্রত।

ভারতীয় সভ্যতায় স্বাঙ্গীকরণ

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলেই প্রথম যে জিনিষটি চোখে পড়ে, সেটি ইহার 'স্বাঙ্গীকরণ' বা 'আত্মসাৎ-করণের' শক্তি। ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক-সম্পাত

করিয়াছেন। নেতাজী তাঁহার টোকিও বক্তৃতায় ভারতীয় সভ্যতার এই প্রসিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন, ভারত-মাতার জঠরে জারক রসের প্রচুর্য্য আছে বলিয়াই ভারত আজও জীবিত, কিন্তু মিশর ও বেবিলন, ফিনিসিয়া ও গ্রীসের প্রাচীন গৌরব আজ কোথায়? শাশ্বত ভারতই ছিল সুভাষচন্দ্রের ধ্যানের ভারত, তাই ভারতভূমির শৃঙ্খল-মোচনের জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সুভাষচন্দ্র মৃন্ময়ী ভারত-জননীর মধ্যে চিন্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই জননীকে তিনি পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারত শাশ্বত ধর্ম্মের আদর্শের ন্যায় যুগধর্ম্মের আদর্শও স্থাপন করিয়াছে এবং এই যুগধর্ম্মকে স্বীকৃতি দান করিয়াই সে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। দেশমাতৃকার আরাধনা এবং তাঁহার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য সর্ব্বস্ব-পণ—ইহাই নেতাজীর দৃষ্টিতে ছিল যুগধর্ম্মের আদর্শ। ভারতকে স্বাধীন হইতেই হইবে কিন্তু কঃ পন্থাঃ? কোন পন্থা বিদেশী বলিয়াই ভারত উহা বর্জন করিতে পারে না, প্রয়োজন হইলে সে নূতন পন্থারও উদ্ভাবন করিতে পারে,—আর এইখানেই তো ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

কঃ পন্থাঃ

মহাত্মা গান্ধী অহিংসাকেই ভারতের মর্ম্ম-বাণী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। দেশবাসীকে তিনি একদিন 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনে যোগদানের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং সেদিন দেশবাসীও তাঁহার আহ্বানে বিপুল ভাবে সাড়া দিয়াছিল। তারপর হইতে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির ইতিহাস সকলেই জানেন। উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য এই, 'অহিংসাই ভারতের মর্ম্মবাণী' ইহা আংশিক সত্য মাত্র। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ স্থাপন করিয়াছে সত্য কিন্তু আমাদের যে

দুইখানি মহাকাব্যে ভারতীয় সাধনার পরিপূর্ণ রূপটি দেখিতে পাই তাহাতে যেমন অহিংসার আদর্শকে মহিমান্বিত করা হইয়াছে, তেমনই লোক-সংস্থিতির জন্য ধর্ম্মযুদ্ধের প্রয়োজনও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা অধিকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই অধিকারবাদ গুণত্রয়-বিভাগের উপর স্থাপিত। স্বয়ং পার্থসারথি কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও নৈসর্গিক গুণবিভাগ, কর্ম্ম-বিভাগ ও অধিকারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। গৃহীর ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, রাজার ধর্ম্ম ও প্রজার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে এক নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যুদ্ধ কাহারও কাম্য নহে, কিন্তু শান্তি-স্থাপনের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলেই যুদ্ধ যে অনিবার্য হইয়া উঠে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই প্রচার করিয়াছেন। গীতার আদর্শ হিংসাও নহে, অহিংসাও নহে, ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণপূর্ব্বক প্রকৃতি-নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান। গীতার এই আদর্শকেই শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী, শিখ ধর্ম্মের সংস্কারক গুরুগোবিন্দ সিংহ, গীতার অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও প্রাক্-গান্ধী যুগের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা লোকমান্য তিলক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন আর গান্ধীজী গ্রহণ করিয়াছিলেন বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বঙ্কিম-চন্দ্রের ন্যায় সুভাষচন্দ্রও মহাভরতের শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বাঙ্গীণ মানবতার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্র ছিলেন আজন্ম সংগ্রামী,—অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি চিরদিন উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন, 'যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।' এই সংগ্রামী মনোভাব, এই যুযুৎসা তাঁহাকে দান করিয়াছিল বিস্ময়কর কর্ম্মশক্তি এবং তাঁহার জীবনে আনিয়াছিল অভাবনীয় সাফল্য।

অখণ্ড ভারত 'যুগে যুগে'

অনেকের ধারণা, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বা ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার ফলেই আমাদের মনে অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা জাগিয়াছে। নেতাজী তাঁহার

টোকিও বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে তিনি এই শিক্ষাই গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারত যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করিয়াছে, মহাভারত রচনা করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরবময় যুগে, সম্রাট অশোকের সময়ে সমগ্র ভারত (এ যুগের ভারত হইতে বৃহত্তর) ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। তারপর গুপ্ত যুগে ও মোগল যুগে ভারতবর্ষের যে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাহারও মূলে ছিল ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সাম্রাজ্য। ভারত অবশ্য যুগে যুগে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়াছে কিন্তু ইংরেজ ভারতবর্ষে ভেদনীতির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে নির্বীর্য ও নিরস্ত্র করিয়াছে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে ভারতীয়গণ যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে, নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তাহা প্রমাণ করিয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যত্রয়ীর' মধ্য দিয়া যে মহাভারতের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, রবীন্দ্র ও অরবিন্দ যে অখণ্ড, অবিভাজ্য ভারতের ধ্যান করিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই আদর্শ ও ধ্যানকেই রূপায়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন, ভারতের গৌরবময় অতীতে যাহা সত্য হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতেও সত্য হইবে। আর ভারতের ভবিষ্যৎ হইবে অতীতের চেয়েও গৌরবোজ্জ্বল।

সমন্বয়ের আদর্শ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার অনেক স্থলে এ কথা বলিয়াছেন যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। আর এই কারণেই আদর্শগত বিরোধ ভারতে কোন দিনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ভারতের এই সমন্বয়ের আদর্শ নেতাজীকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার জীবন-দর্শনের মূল কথা ছিল—সমন্বয়। রাষ্ট্রদর্শনেও যে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে, সে কথা বোধ হয় নেতাজীর মত সুস্পষ্ট ভাষায় আর কেহ বলেন নাই। দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক দিয়া নেতাজী একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মতবাদেই আংশিক সত্য নিহিত আছে। হেগেলের মতবাদকে তিনি 'সত্যের

নিকটবর্ত্তী' বলিয়াছেন, কিন্তু অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সাংখ্যের পরিণামবাদ ও বৈষ্ণব দর্শনের লীলাবাদ,—সুভাষচন্দ্রের মতে এ সকলই সত্য, তথাপি, মায়াবাদকে তিনি তত্ত্বহিসাবে স্বীকার করিলেও ব্যবহারিক জীবনের দিক হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের সিদ্ধান্তকেও তিনি আংশিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই উহার একমাত্র ব্যাখ্যা নয়,—আর অর্থনীতির দিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার অর্থ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে অস্বীকার করা—ইহাই ছিল নেতাজীর অভিমত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যাহা কল্যাণকর, তাহার সমন্বয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্ভব, যে রাষ্ট্র দেশ হইতে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর করিতে পারিবে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও সুভাষচন্দ্রের এই সমন্বয়ী দৃষ্টির মূলে ছিল ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা।

সুভাষচন্দ্রের বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তাঁহার অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভা, তাঁহার দুর্জ্জয় পৌরুষ ও কর্ম্মক্ষেত্রে মহতী সিদ্ধি আমাদের মনে বিস্ময় জাগায় কিন্তু তাঁহার কর্ম্মধারার উৎস সন্ধান করিতে হইলেই আমাদিগকে তাঁহার 'ভারত-দর্শনে'র তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হয়।

আজ নেতাজীর স্বপ্নকে সার্থক করিবে কে? স্বামীজির মত নেতাজীও খাঁটি মানুষ চাহিয়াছিলেন। স্বামীজি প্রচার করিয়াছিলেন: 'man-making religion,' আর নেতাজী শিক্ষা দিয়াছিলেন 'man-making politics'. কিন্তু আজ দেশে মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়, এমন 'ডায়োজিনিস্'ও বুঝি নাই।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'আবার আসিবে কি মা!'

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও ধ্রুব ভারত

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।"

মানুষ একদিন জড়ে ও চেতনে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা কল্পনা করিয়াছিল, প্রাণী-জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্-জগতের যোগসূত্র সে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র চলিয়াছে এক অখণ্ড চৈতন্যের লীলা। ভারতীয় ঋষি একদিন উদাত্ত কণ্ঠে যে ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে বাণী যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জগদীশচন্দ্রই তাহা বিস্ময়বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র শুধু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নহেন, তাঁহার মধ্যে বিজ্ঞানীর সত্যানুসন্ধিৎসা, কবির কল্পনা ও ঋষির ধ্যানদৃষ্টি এক অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জগদীশচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্য দিয়া যে মানুষটির মূর্তি আমাদের মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠে, তিনি স্বদেশ-প্রেমিক, স্বাজাত্য-বোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃভূমির গৌরবময় অতীতে এবং অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থাবান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের যে মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, সে কথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনী' নামক কাব্যগ্রন্থ এই ভাবে জগদীশচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন—

"সত্য রত্ন দিলে তুমি, পরিবর্ত্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।"

কবিগুরুর সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্যের যে সমস্ত পত্রালাপ হইয়াছে, সেগুলি যে চিরকাল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশ্বের বরেণ্য এই মনীষিদ্বয় ভারতীয় সাধনার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতিই এই সাধনার বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই সত্যদ্রষ্টা—একজন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনুভূতির দ্বারা, আর একজন সত্যের সন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার বন্ধুর পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি, অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না ; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারে শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'। (অব্যক্ত)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে আর একটি জায়গায় আশ্চর্য মিল আছে। যে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে কবি সমগ্র জীবন অনলসভাবে কাব্য-সাধনা করিয়া চলিয়াছেন, কবি তাহার নাম দিয়াছেন—জীবন-দেবতা। অবশ্য এই জীবন-দেবতা কবির নিকট বিচিত্র-রূপিণী হইয়া দেখা দিয়াছে। জগদীশচন্দ্রও এইরূপ একটি অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশ শুনিতে পাইয়াছেন এবং উহা শিরোধার্য করিয়াছেন। সক্রেটিসের অন্তর-পুরুষ

(Genius of Socrates) তাঁহাকে বলিয়া দিতেন, কোন্ পথ বর্জন করিতে হইবে; আর জগদীশচন্দ্রের অন্তর-পুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছেন, কোন্ পথে চলিতে হইবে। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের সাধক হইয়াও অলোকপন্থী (mystic) তাপসগণের ন্যায় দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছেন, এ কথা ভাবিতেও বিস্ময় জন্মে। তাঁহার "হাজির" নামক প্রবন্ধের একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম—'বিদেশ যাও'। বিদেশ যাত্রা! সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম —"আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল। লাভালাভ বলিবার তুমি কে।" আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্র প্রধানত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিলেও তাঁহার রচনার সাহিত্যিক মূল্য অল্প নহে। শিশুদিগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় যে জগদীশচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। বৈজ্ঞানিক রচনাকে হাস্যরসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় কৃতকার্যতা বাংলা দেশে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। (বঙ্কিমচন্দ্রের দু-একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও হাস্যরসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছে, যেমন— "চন্দ্রলোক"।) জগদীশচন্দ্রের রচনার আর একটি প্রধান গুণ—সরলতা ও স্পষ্টতা। তাঁহার কোন কোন রচনায় কবিদৃষ্টি ও রসানুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ফলত, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার্ জেম্স্ জীন্সের ন্যায় জগদীশচন্দ্রও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন—"বন্ধু। যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করেছ তবুও সাহিত্য-সরস্বতী সে পদ দাবী করতে পারত।"

এবার আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বৃক্ষ সাধারণত কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য জগদীশ চন্দ্র ক্রেস্কোগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এই যন্ত্রের নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন বৃদ্ধি-মান। তিনি প্রথম প্রথম তাঁহার নূতন যন্ত্রগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলেন, যথা—কুঞ্চন-মান এবং শোষণ-মান। তারপর

আমেরিকা বিশ্ববিত্থালয়ের একজন অধ্যাপক যখন জগদীশচন্দ্রকে 'কাঞ্চনম্যান' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন জগদীশচন্দ্র 'কুঞ্চন-মানের' এই অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের নামকরণের জন্য আর কখনও সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইবেন না। জগদীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের বুদ্ধিমান নামকরণের ইচ্ছা একেবারেই চলিয়া গিয়াছে! বুদ্ধিমান, তাহা হইতে বার্ডোয়ান হইত। তার চেয়ে ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।" (অব্যক্ত)

বিজ্ঞান যে মানুষের জীবনে আশীর্বাদ না হইয়া চরম অভিশাপ হইতে পারে এবং সভ্যতার মৃত্যু ঘটাইতে পারে, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বহু পূর্বেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের মতে বিজ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য— ঐক্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবতার সেবা। এই দিক দিয়া জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ভারতীয় সাধনার যোগ্য অধিকারী। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বিশ্বের নিয়তপরিবর্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্যকে শুধু তাহারাই পায়।"

জগদীশচন্দ্রের জীবনে তাঁহার পিতৃদেবের প্রভাব বিপুল। জগদীশচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই

সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম।" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতেই স্বদেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন দুঃসাহসের লক্ষণ ছিল। জগদীশচন্দ্রকে সর্বপ্রথম বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়া তাঁহার পিতা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কত গভীর ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিক্রমপুর-সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণ হইতে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

বাংলার পতিত অস্পৃশ্য জাতিদের সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—

"পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমস্ত জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।"

এই অভিভাষণে স্বদেশবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন— "যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও, তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

"তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক

সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্য ভাবে আসিত। তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ?" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্রের রচনা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নানা প্রবন্ধে এইরূপ জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যাহা কিছু মহিমময়, তাহার প্রতি জগদীশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি ভারতের অন্তরাত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন; প্রবচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহুশ্রুতত্বের দ্বারা যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা জগদীশচন্দ্র তাহার স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মানবসত্য

আমাদের দেশে লঙ্কেশ্বর রাবণ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। রাবণ নাকি পৃথিবী হইতে স্বর্গে বা দেবলোকে যাইবার জন্য সিঁড়ি তৈয়ার করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দীর্ঘসূত্রতার জন্য তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই।

কাহিনীটির মধ্যে যে একটি উপদেশ আছে, তাহা সুস্পষ্ট। রাবণের ইচ্ছা পূর্ণ হইলে, আমাদের কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হইত সে বিচারে প্রয়োজন নাই কিন্তু কাহিনীটি যে মিথ্যা, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। মিথ্যা, কারণ স্বর্গে ও মর্ত্যে 'সেতুবন্ধন' বা সম্পর্ক-স্থাপনের শক্তি লঙ্কেশ্বরের ছিল না! ছিল কবীশ্বর বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, কালিদাস, মিল্টনের, ছিল বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের। ইহারা সকলেই ছিলেন একাধারে রসস্রষ্টা ও ক্রান্তদর্শী, সকলেরই তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল। রাবণ ভ্রাতা বৈশ্রবণ বা কুবেরের কামগামী বিমান হরণ করিয়া অবাধে স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করিতেন কিন্তু সেই বলদৃপ্ত লোক-ভয়ংকর লঙ্কেশ্বরের পক্ষে লোককল্যাণকর কোন কার্য সম্পাদন করা সাধ্যাতীত ছিল।

পৃথিবীর যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা শুধু রসস্রষ্টা নন, তাঁহারা স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁহারা অভয়রূপ শ্রেষ্ঠ সম্পদের দাতা। 'তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে',—ইহাই তাঁহাদের ব্রত। এক অর্থে তাঁহারা প্রত্যেকেই মানুষের জন্য স্বর্গারোহণের সোপান-মঞ্চ নির্মাণ করেন, কারণ, তাঁহারা মানুষকে প্রয়োজনের অতীত উর্ধ্বলোকে লইয়া যান এবং আমাদের এই মর্ত্য পৃথিবীকেও দেবপীঠ-স্থানে পরিণত করেন। যে ঋষি মানুষকে 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি যে ক্রান্তদর্শী কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অবশ্য সংসারে এমন অনেক বিজনবাসী কবি আছেন, যাঁহারা শুধু আপন মনের সুখ-দুঃখের গান গাহিয়া আমাদিগকে মোহিত করেন। বিহারীলাল প্রধানত এই শ্রেণীর কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও আপন হৃদয়ের

আনন্দ-বেদনার গান অজস্র গাহিয়াছেন এবং বাংলার গীতি-কবিতাকে অপরিসীম ঐশ্বর্য-সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা ইহার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তিনি শুধু সৌন্দর্যবিলাসী কলা-কুতূহলী কবি ছিলেন না। স্বদেশ, সমাজ ও নিখিল বিশ্ব সম্পর্কে তাঁহার চিত্ত সর্বদা জাগরূক ছিল। উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ মানাবাত্মার মহিমায় বিশ্বাসী ছিলেন। বলদৃপ্ত, সভ্যতাভিমানী, আভিজাত্যগর্বী মানুষ কর্তৃক মানুষের লাঞ্ছনাকে তিনি সহস্র বার ধিক্কৃত করিয়াছেন। 'বুয়ার যুদ্ধ' বিষয়ক কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠির জবাব পর্যন্ত অজস্র রচনার ভিতর দিয়া কবি তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিচিত্ত যখন মানবের লাঞ্ছনায় রোষে গর্জন করিয়া উঠিয়াছে, তখনও তিনি এই বিশ্বাস জাগরূক রাখিয়াছেন যে, মানবাত্মার অবমাননা পৃথিবীতে কখনও চিরন্তন হইতে পারে না। স্বর্গে ও মর্ত্যে যে সম্পর্ক আছে, আর বিধাতা যে মানুষের উপরেই এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য রচনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকের হস্তে ন্যায়ের দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, কবির হৃন্মর্ম-মূলে এই বিশ্বাস বাসা বাঁধিয়াছিল। এই প্রত্যয়ের মূলে ছিল কবির এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। যে মানব-সত্য বা মানুষের ধর্মের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ, উহা প্রতীচ্যের 'হিউম্যানিজম' নহে, উহা একটি সমন্বয়ের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় একদিকে উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও বাউলের যেমন প্রভাব আছে, অপরদিকে তেমনই হয়তো কবি শেলি ও দার্শনিক বের্গসঁর প্রভাব আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই তিনি কবি-দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন।

উপনিষদ ও ঐক্যের আদর্শ

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার উপর উপনিষদের প্রভাবও বিপুল: কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা শুধু উপনিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অবশ্য

রাজা রামমোহনের মত রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের মধ্যে মানবের ঐক্যের আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। রামমোহনের যুগে ইহা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু রবীন্দ্র-যুগে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে মানুয়ের বুদ্ধি অনেকটা মোহ-নির্মুক্ত হইয়াছিল। ঈশোপনিষদের দুইটি শ্লোকে শুধু মানুষের নয়, সর্বভূতের ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে। এই ঐক্যের বাণী যে ভারত-আত্মার বাণী, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উপনিষদের শ্লোক দুইটি এই—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যিনি নিজ আত্মায় সমস্ত জীবকে দর্শন করেন এবং সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত ভূতকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন, তাই তিনি শোক ও মোহ হইতে মুক্তিলাভ করেন।"

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে মানবসত্য স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন ধর্মে তীর্থঙ্করেরা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা মুক্ত পুরুষ, সুতরাং ভুল ভ্রান্তির অতীত; তাই ইহাদের বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জৈন ধর্ম এই আশার বাণী মানুষকে শুনাইয়াছে যে প্রত্যেক মানুষ সাধনার দ্বারা মুক্ত হইয়া তীর্থঙ্করের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। জৈন ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রত্যেক মানুষের মতকে শ্রদ্ধা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরমতসহিষ্ণুতার কথা তাহারাই বলিয়া থাকে যাহারা সত্যকে জানে না। বিশেষজ্ঞেরা জানেন, জৈন দর্শনে 'সপ্তভঙ্গি ন্যায়ের' কথা বলা হইয়াছে।

এই ন্যায় অনুসারে আমার কথা যেমন সত্য, আমার প্রতিপক্ষের কথাও তেমনই সত্য যদিও আমাদের সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী। দুঃখের বিষয়, এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেও আমরা অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখি নাই, তাই লাঠির যুক্তিকেই শ্রেষ্ঠ যুক্তি বলিয়া মনে করি এবং মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্ এই বচনে আজও বিশ্বাস করি।

জৈন দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনও মানুষকে মহত্তম মর্যাদা দান করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষ যে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে একথা স্বয়ং তথাগতও স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষ আপন ভাগ্য-বিধাতা, তাই বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে আত্মশরণ ও অনন্যশরণ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধী। বুদ্ধের উপদেশ সোজা ভাষায় বলিলে দাঁড়ায় এই—পরের মুখে ঝাল খাইও না, সত্যকে নিজে যাচাই করিয়া দেখ।

বুদ্ধদেবের একটি বাণী রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। বুদ্ধদেব সর্বভূতে মৈত্রীভাবনার উপদেশ দিয়াছেন। এই মৈত্রীর আদর্শ মানবতার আদর্শের চেয়ে অনেক বড়, মানবতার আদর্শ সংকীর্ণতর বলিয়াই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীচৈতন্য ও মানব-ধর্ম

সনাতন গোস্বামীর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' মানুষের গৌরব জাতি কুল বা ধনে নহে সে যে কৃষ্ণসেবার মহান অধিকার লাভ করিয়াছে, এইখানেই তাহার গৌরব।

আবার, অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবান মানুষের ভক্তি বা প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত মানুষ-ভাবে লীলা করেন, এইখানেই তাহার উৎকর্ষ। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ'।

শ্রীচৈতন্য যে মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে কেহ কেহ 'দেব-মানববাদ' বলিয়াছেন, কেন না, উহাতে শুধু মানুষ হিসাবে মানুষের মহিমা স্বীকৃত হয় নাই। মানুষ মাত্রেই সেখানে ভগবৎ-সেবার অধিকারী এবং ভগবান একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। রবীন্দ্রনাথের উপর শুধু বাংলার বৈষ্ণবগণের নয়, মধ্যযুগের অন্যান্য প্রদেশের সাধকগণের (কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি) প্রভাবও বিপুল। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে সীমা ও অসীমের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে।

বাউল ধর্ম

বাউলেরা বেদ-বিধি মানেন না। তাঁহাদের সাধনার একটি গূঢ় দিক আছে, তাঁহারা 'পরদেশীর' কাছে আপন সাধনকথা প্রকাশ করেন না। বাউলের গানের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাদের জীবনদর্শনের কিছু কিছু পরিচয় পাই। তাঁহারা মানুষ হিসাবে মানুষের মহিমায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা বলেন, সকল মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন মানুষ আছেন। তাহারা সেই 'মনের মানুষের' সন্ধান করেন এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ভবসিন্ধু পার হইয়া যান্। বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই গুরুবাদে বিশ্বাসী। মদন বাউল বলেন, পরম গুরু যুগ-যুগান্তে শিষ্যের মানস-মুকুল বিকশিত করিয়া তোলেন। (মদন বাউলের এই গানটি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উদ্ধৃত করিয়াছেন।) রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল ধর্মের প্রভাব যে কম নয়, কবির অজস্র গানে এবং 'Religion of Man' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।

খ্রীষ্টীয় ও প্যাগান দৃষ্টি

যীশুখ্রীষ্ট-প্রবর্তিত ধর্মের মূল সূত্র দুইটি—তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে ভালবাস এবং প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর। (Love thy neighbour as thyself)। যীশুখ্রীষ্ট যে মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের পিতৃত্বের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা; মানুষ হিসাবে মানুষের মহিমার কথা ঈশা কোথাও

প্রচার করেন নাই। কিন্তু গ্রীকদেশে যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহধারী মরণশীল মানুষেরও একটি স্বতন্ত্র মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। মধুসূদন আমাদের দেশে সেই মানব-মহিমার কবি। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজ জাতি একদিকে যেমন নানা দিগ্দেশ জয় করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই প্যাগান ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাহারা যে নূতন জীবন-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় মিলে নাট্যকার মার্লোর 'ট্যাম্বারলেন' নামক নাটকে। পরবর্তীকালে, রোমান্টিক যুগে শেলি তাঁহার 'প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ডে' সর্ববন্ধন-মুক্ত মানুষের জয়গান গাহিয়াছিলেন। এদিকে দার্শনিক ক্যাণ্ট প্রচার করিয়াছিলেন, 'মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তি-সত্তাকে স্বীকৃতিদান করিও, কোন মানুষকেই নিজের সুখ-সুবিধার যন্ত্রে পরিণত করিও না'। উনবিংশ শতাব্দীর কবি টেনিসন তাঁহার 'ইউলিসিস' কবিতায় মানুষের অন্তরের সেই দুর্দমনীয় স্পৃহার কথা বলিয়াছেন, যে স্পৃহা মানুষের সমস্ত উন্নতির মূলে বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথ ও মানব-ধর্ম

রবীন্দ্রমানসে যে নানা ভাবধারা মিলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ যে মানব-সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই—

(ক) ফুল সহজে বিকশিত হয় কিন্তু মানুষকে সাধনার মধ্য দিয়া, তপস্যার মধ্য দিয়া নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়। সৃষ্টির রাজ্যে মানুষের দুঃখ মহত্তম বলিয়াই তাহার গৌরব অধিক।

(খ) প্রত্যেক মানুষ এক হিসাবে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত, আর এক হিসাবে সে মুক্ত বা স্বতন্ত্র।

(গ) মিলনের বা ঐক্যের মধ্যে দিয়াই মানুষ চরম সার্থকতা লাভ করে; যেখানে সে ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে, সেখানেই সে ব্যর্থ হয়।

(ঘ) মানুষ হিসাবে মানুষের একটি স্বতন্ত্র মহিমা আছে আবার ভূমার জন্যও তাহার একটি স্বাভাবিক আকুতি অছে।

(ঙ) এই আকুতি জ্ঞানের রাজ্যে মানুষকে কখনও স্থির থাকিতে দেয় না। তাই নিত্য নূতন অজানার অভিসারে তাহার যাত্রা।

(চ) ধর্মের ক্ষেত্রেও এই আকুতি মানুষের অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হইয়াছে। মানুষ জ্ঞানে ও প্রেমে বিশ্ব-দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছে, আবার রসের সাধনার মধ্য দিয়াও তাঁহার আস্বাদন করিয়াছে।

(ছ) সৌন্দর্যবোধ মানুষের আর একটি ধর্ম, সৌন্দর্যবোধ আমাদের জীবনে আনে সামঞ্জস্য।

(জ) মানুষ ক্রমাগত এই জীবনেই বহুবার জন্মগ্রহণ করে। দার্শনিকের ভাষায় মানুষের জীবন infinite becoming ; মানুষ প্রতিদিন নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে, এই সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে মানবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ

মানুষের জীবন একটি অখণ্ড সত্তা, তাই তাহাকে কয়েকটি বিভিন্ন কক্ষে ভাগ করা চলে না। উদ্ভিদ যেমন বাহির হইতে আলো-বাতাস আহরণ করিয়া আপন স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মানুষও তেমনই বাহিরের পরিবেশ হইতে বিক্ষিপ্ত ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে। কিন্তু মানুষকে শুধু বাঁচিলে চলে না, তাহাকে বাড়িতেও হয়, শুধু গ্রহণের মধ্য দিয়াই সে সার্থকতা লাভ করে না, তাহাকে ভূরি পরিমাণে দানও করিতে হয়। এই দানের মাত্রার উপরেই তাহার সার্থকতার মাত্রা নির্ভর করে। সহস্র গুণে আপনাকে উৎসর্গ করিবার জন্য সূর্য যেমন পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করে (সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ), তেমনই পৃথিবীর প্রতিভাশালী চিন্তানায়কগণ আমাদিগকে নব-নব সম্পদে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার জন্যই নানা জনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে নিজের মধ্যে সংহত করেন। আমরা যখন কোন লোকোত্তর পুরুষের কথা আলোচনা করি, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল? রাজনীতি ও সমাজ-নীতিতে ইনি কোন্ নূতন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন? ধর্ম সম্পর্কেই বা ইঁহার ধ্যান-ধারণা কিরূপ ছিল ইত্যাদি। এরূপ প্রশ্নের আলোচনায় আমাদের কৌতূহলের খানিকটা নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ পরিচয় মিলে না। আমাদের দৃষ্টি যেখানে খণ্ডিত, সেখানে আমরা অখণ্ড মানুষের পরিচয় পাই না। আমরা যখন কোন কবির রচনাবলী কালানুক্রমিক পরম্পরায় সাজাইয়া তাঁহার কবি-মানসের অভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণের চেষ্টা করি বা কোন মহাপুরুষের কার্য-কলাপের বিচার করিয়া তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের প্রয়াস পাই, তখন হয়তো আমাদের আলোচনা অধিকতর সার্থক হয়। তথাপি যাঁহারা যুগন্ধর পুরুষ, তাঁহাদের সম্পর্কে খণ্ডিত আলোচনারও প্রয়োজন আছে। খণ্ডের সমষ্টি কখনও অখণ্ড

হইতে পারে না, এ কথা সত্য বটে কিন্তু খণ্ড যে অখণ্ডেরই বিশেষ প্রকাশ (অংশ নয়), তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তাই আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমাদের আলোচ্য বিষয়—রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ। অবশ্য, ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য্য।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের সমাজ-বিপ্লব ও ধর্মান্দোলনের ইতিহাস।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সাধনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ও রাজা রামমোহনের পরোক্ষ প্রভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কতটা পরিমাণে রাজা রামমোহনের অনুগামী ছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্র-কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে এক হিসাবে কবিগুরুর জীবন সম্বন্ধেও সত্য, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তাই বিশেষ অর্থে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হইল তারা' এ কথা কবিগুরুর উদ্দেশ্যেও বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ-সম্পর্কিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর নানা সাধনার বিচিত্র প্রভাবের কথাও আলোচনা করিতে হয়। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্র, উপনিষদের ঋষিগণের ব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধ ধর্মের চারিত্র-নীতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং ভারতের অন্যান্য ভক্ত সাধকগণের প্রেম-ধর্ম, বাউল সাধকের মানুষের ধর্ম প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার আলোচনাও স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। এমন কি, পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কতটা আপন সংস্কারের অনুরূপ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাহার আলোচনাও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলায় ধর্মান্দোলনের যে তিনটি প্রধান ধারা ছিল,—কেশবচন্দ্রর নববিধান, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীদের প্রচারিত নব্য হিন্দুধর্ম (শশধর তর্ক-চূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

সেনের কথা নাই বলিলাম), এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদান্তের অভিনব ব্যাখ্যা ও ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের নিকট কেন গ্রহণযোগ্য হয় নাই, তাহারও কারণ বিশ্লেষণ করিতে হয়। কিন্তু আজ আমরা এই সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না, আমাদের শক্তি ও অবসর অত্যন্ত অল্প বলিয়াই এরূপ বিশদ আলোচনার গহন অরণ্যে পথ হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা আছে। লোকে যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে, তেমনই আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাঁহার ধর্ম বা অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে প্রবেশ করিব।

আমাদের 'ধর্ম' ও পাশ্চাত্ত্যের 'রিলিজিয়ন' যে এক বস্তু নয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ ধর্মকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, তাই তাঁহারা মানুষের জীবনকে 'লৌকিক জীবন,' 'অধ্যাত্ম জীবন' প্রভৃতি কক্ষে ভাগ করেন নাই। আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মই যাহাতে ধর্মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়, ঋষিগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে আমাদের জীবনে সুফল ও কুফল উভয়ই ফলিয়াছে। সুফল হইয়াছে এই যে, আমরা সম্পদে বা বিপদে প্রমত্ত বা বিভ্রান্ত হই নাই আর প্রধান কুফল ঘটিয়াছে এই যে, আমরা 'পদে পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষেধের ডোরে' বাঁধা পড়িয়াছি, আচারের মরুবালিরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের বিচারের স্রোতঃপথকে গ্রাস করিযা ফেলিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বুঝিয়াছেন, যাহা লোকসংস্থিতির মূল, তাহাই ধর্ম। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ধর্ম লোক সকলকে ধারণ করে, যাহা হইতে লোক সকলের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম, ইহা নিশ্চিত জানিবে'। 'সদাচার' লোক সকলকে রক্ষা করে বলিয়াই উহাকে ধর্ম সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু সদাচার নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায় মাত্র, তাই বলা হইয়াছে, ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথও ধর্মকে মানুষের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টি যে ভ্রান্ত, এ কথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, কিন্তু 'ধর্মশাস্ত্রে' যে অর্থে ধর্ম কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে,

রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

'যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'

উহাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের আদর্শ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের ভাবধারার উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা গায়ত্রীমন্ত্র।······গায়ত্রীমন্ত্র বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগ-সাধন ক'রে।'

রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন 'ধর্মের সরল আদর্শ'। উপনিষদ আমাদিগের নিকট নানা ভাবে এই আদর্শের কথাই প্রচার করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই ভারতেই একদিন আমরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্যকে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সেদিন ভগবান তথাগত আবির্ভূত হইয়া আমাদের বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর আমরা তন্ত্রে-মন্ত্রে ধর্মের পথকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছি, ধর্মকে 'হাটক-পেটকের' ন্যায় গোপনীয় একটা বস্তুতে পরিণত করিয়াছি। ফলে, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে বলিয়াছেন—

'এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, ধর্মকে মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়া-কর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি আমাদের প্রণিধান-যোগ্য, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, জীবন-শিল্পী। ধর্ম-সাধনা তাঁহার নিকট পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনারই একটি অঙ্গ। ব্রহ্মোপাসনাকে তাই তিনি তাঁহার জীবনের নিত্য কর্ম হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম-সাধনায় বুদ্ধি ও বোধি

উভয়েরই স্থান আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন,—'ধর্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়'। এ কথার সত্যতা ভারতের ঋষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন, ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইলে বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হইবে, তবে তিনি ভ্রান্ত। এই বিচার-হীনতা যে আমাদের সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বিচার-মূঢ়তার সুযোগ লইয়া অবতারের দলে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত ভয়াবহ ভণ্ড সান্ন্যাসীও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া পূজিত হইতেছে। গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন—'সেই পরম দেবতা আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন'। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমাদের ধী বা বুদ্ধিই হইতেছে ব্রহ্মের সহিত আমাদের সংযোগ-সূত্র। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধী বা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই ধ্যান-যোগের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'যে প্রেম নিজেরে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে', সেই প্রেমকে কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যাঁহারা প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সত্যই যাঁহাদের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইতে দেখা গিয়াছে বা ভগবদ্-বিরহে যাঁহারা জগৎ শূন্যায়িত বোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সকলের নমস্য। কিন্তু যাঁহাদের শুধু স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফলে দেহে নানারূপ বিকৃতি দেখা যায়, তাঁহারাও অনেক সময়ে ভক্ত বা প্রেমিক বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে হরিনামে নর্তন-কুর্দনের চেয়ে শান্তভাবে উপাসনা বা নাম-জপই অধিকতর কল্যাণের পন্থা। ভাবাতিরেক বা ভাবোন্মাদনাকে প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া যে আমরা অনেক সময়ে বিপাকে পড়িয়াছি, সে কথা অস্বীকার করিবে কে ?

ধ্যানের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। তাঁহার কবি-দৃষ্টিও অনেক সময়ে তাঁহাকে সত্যের উপলব্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। 'প্রার্থনা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মহাপুরুষের' একটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন যাহা মনে রাখিলে আমরা কখনও বিভ্রান্ত হইব না। তিনি বলিয়াছেন—

'জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে অনিবার সহায়তা করেন'। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

'মনুষ্যত্বের সমস্ত মহা সত্যগুলিই পুরাতন……এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ'। আবার ধর্মের এমন একটি লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে মহাভারতকারের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই যে মিলন বা ঐক্যের আদর্শের কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল রহিয়াছে উপনিষদের ঋষিগণের সাধনার মধ্যে। শুধু তাহাই নহে, ইতিহাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সনাতন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছেন, সে ভারতবর্ষের সাধনাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা। এক দিকে এই ঐক্য বা মিলনের আদর্শ, আর এক দিকে বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী-ভাবনার আদর্শ,—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতাত্মার বাণী। 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের যে উপদেশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটি এই—'মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধ-দিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে'।

এই ঐক্য ও মিলনের আদর্শ, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ এ যুগের সভ্যতাস্পর্দ্ধী মানুষ কর্তৃক বারে বারে পদ-দলিত হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য দেশ বীভৎস রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে, ভারতের আকাশ বাতাস বারে বারে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, মানবতার এই লাঞ্ছনায় কবির চিত্ত ক্ষুব্ধ রোষে গর্জন করিয়াছে। মানুষের আত্মিক মহিমায় বিশ্বাসী কবি মানুষের ভদ্রবেশী বর্বরতায় বিচলিত হইয়াছেন এবং নির্ভীক কণ্ঠে মানুষের পুঞ্জীভূত অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন তান্ত্রিক সাধকের মত সৃষ্টি-রহস্যের একেবারে মর্ম-মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছেন! তান্ত্রিক সাধকের মতই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, রাত্রি স্নেহময়ী জননীর মত আমাদের কর্মক্লান্ত তনুকে আপন বক্ষে আকর্ষণ করে। দিবসে আমরা শক্তির প্রয়োগ করি, রাত্রিতে আমরা নিখিলের সঙ্গে যুক্ত হই। দিনের আলোক পৃথিবীকে উদ্ঘাটন করে, রাত্রির অন্ধকারে জ্যোতিষ্ক-লোকের দ্বার খুলিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'আমরা একই সঙ্গে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে'।

দিবস ও রাত্রির তাৎপর্য্য যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন জীবন ও মৃত্যুর অর্থও তাঁহার কবি দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। মৃত্যুও যে স্নেহময়ী জননীর মত আমাদিগকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লয়, রবীন্দ্র-কবি-মানসে এই সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি'।

ঋগ্বেদেও 'রাত্রিসূক্তে' রাত্রিকে 'করুণাময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী' ও 'জননী' বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। আবার, কেহ কেহ রাত্রির মধ্যে ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু রাত্রির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করিতে হইলে তো সাধনার প্রয়োজন। এইজন্য যাঁহারা গভীর ভাবে চিন্তা করেন ও গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের নিকট অন্ধকার আলোর অভাব মাত্র নহে, মৃত্যু বিভীষিকা নহে। অধ্যাত্ম সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করিলেই মানুষ মৃত্যু-ভয়কে অতিক্রম করিতে এবং মৃত্যুর মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, ধর্মসাধনা ও শিল্পসাধনা এক বস্তু নয়, ধর্মসাধনায় কল্পনা-বিলাসের স্থান নাই, দুঃখকে যে স্বেচ্ছায় বরণ না করে, সে ধর্মের বা মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে কবি বলিতেছেন—

'মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না, যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয় বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে'।

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেন উপনিষদের ঋষির উক্তিরই ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতেছি—

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

কবি তাঁহার অজস্র কবিতায় ও প্রবন্ধে এই বীর্যের আদর্শ, এই অপরাজেয় পৌরুষের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সে আদর্শ গ্রহণ করি নাই। কবি তাঁহার অজস্র কাব্যগ্রন্থে ও গানে, এবং 'শান্তিনিকেতন' (১ম ও ২য়), 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম' 'পথের সঞ্চয়,' 'সঞ্চয়', 'Religion of Man' প্রভৃতি গদ্য রচনায় ধর্মের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, সে সম্পর্কে আজ পর্যন্তও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। একথা অবশ্য সত্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শিল্পী, ধর্ম-প্রচারক বা কোন ধর্ম-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক নহেন। কিন্তু উপনিষদের ভাবধারায় নিষ্ণাত রবীন্দ্রনাথ, ভারত-আত্মার অন্যতম বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বের বরেণ্য মনীষী রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আমরা যদি মননের দ্বারা সেই আদর্শকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কবি তাহা হইলে যে আমরা যথার্থ কল্যাণ লাভ করিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কর্ম্মযোগী বালগঙ্গাধর তিলক

উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে ভারতের দুইটি বিভিন্ন প্রদেশে এমন দুইজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যতেজে দীপ্যমান হইয়াও ক্ষাত্রবীর্য্যে অপরাজেয় ছিলেন। ইঁহাদের একজন বাঙ্গালী, আর এক জন মহারাষ্ট্রীয়, একজন 'ইসাপন্থী হিন্দু' আর এক জন সনাতনী হিন্দু; একজন সত্যই বন্দনীয় উপাধ্যায়, আর একজন 'চিৎপাবন ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ যাঁহার স্মরণে-মননে চিত্ত পবিত্র হয়; একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আর একজন কর্ম্মযোগী গৃহস্থ। অথচ উভয়েই ভারতকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনে মহত্তম দুঃখকে বরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, আর একজন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। এই দুইজন মহাপুরুষের পুণ্যকথা যতই আমরা অনুধ্যান করিব, ততই মনুষ্যত্বের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিব। অথচ, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের বাঙ্গালী ব্রহ্মবান্ধবকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন, আর স্বাধীন ভারতের নানা স্থানে যদিও বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার বিপুল ও বহুমুখী কর্ম্মধারার উৎস-সন্ধানে আমাদের প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না।

বালগঙ্গাধর তিলকের মধ্যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে বিপুল আত্মপ্রত্যয় ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি যদি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক না হইতেন, তাহা হইলে অধিকতর সম্পদে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করিতে পারিতেন এবং পৃথিবীর অন্যতম জ্ঞানতাপস বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন। তাঁহার রচিত Orion ও Arctic Home of the Vedas পৃথিবীর বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ও ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। অবশ্য, আর্য্য জাতির আদি বাসভূমি-সম্পর্কে মহামতি তিলকের যে সিদ্ধান্ত,

তাহা সকল পণ্ডিত স্বীকার করেন নাই। তথাপি মনস্বী তিলক তাঁহার Arictic Home গ্রন্থখানিতে জ্যোতির্বিদ্যা ও বৈদিক সাহিত্যে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

লোকমান্য তিলকের বিচিত্র কর্ম্মধারার উৎস সন্ধান করিতে হইলে তাঁহার 'গীতারহস্যের' মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয়। আমাদের দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহু ভাষ্য রচিত হইয়াছে, এ যুগের অনেক পণ্ডিতও গীতার যুগোপযোগী ব্যাখ্যানে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল পণ্ডিতের গীতাব্যাখ্যানের সঙ্গে মনীষী তিলকের গীতাব্যাখ্যানের কিছু পার্থক্য আছে। গীতারহস্যে বালগঙ্গাধর তিলক যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহুশ্রুতত্ব ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। কিন্তু পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের চেয়েও মানুষ তিলক ছিলেন অনেক বড়। ভগবদ্গীতা হইতেই তিনি মনুষ্যত্বের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভগবানের অমৃতময়ী বাণী প্রত্যেক মানুষকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহারও নির্দ্দেশ দিতে পারে। এইখানেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎকর্ষ। গীতার যে অর্থ মহাভারতকারের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তিনি সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গীতার মধ্যে কোন একটা মনঃকল্পিত আদর্শের সন্ধান করেন নাই অথবা গীতার কোন একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিবারও প্রয়াস পান নাই। আমাদের দেশের অনেক ভাষ্যকার গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাহাদের সম্প্রদায়ের অনুকূল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে 'টানিয়া বুনিয়া' কোন কোন শ্লোকের অর্থ করিতে হইয়াছে। মনস্বী তিলক এইরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতার যে আদর্শ তিনি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ ও চর্য্যার দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শ। আমাদের মধ্যে অনেকে নিত্য গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, গীতা যাঁহাদের আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ, এমন লোকের সংখ্যাও হয়তো বিরল নয়, কিন্তু যাঁহারা গীতার কোন একটি বাণীকেও জীবনে সার্থক করিয়া

তুলিয়াছেন, এমন লোক কোথায়! লোকমান্য তিলক কর্ম্মযোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ দেশের 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, আর এইজন্যই জীবনে গুরুতর দুঃখেও তিনি বিচলিত হন নাই। বাস্তবিক, মহামতি তিলকের জীবনে ও বাণীতে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, সন্দেহ নাই; স্বদেশ-প্রেম ছিল তাঁহার নিকট সহজাত সংস্কারের ন্যায় কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ হইতে এবং রামদাস স্বামী প্রভৃতি প্রাক্তন আচার্য্যগণের বাণী হইতেই তিনি এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার', আর এই অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি চিরজীবন আপোষ-বিহীন সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাই রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার চরমপন্থী না হইয়া উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি শুধু মাতৃভূমির বন্ধন-মুক্তি চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন প্রত্যেক ভারত-বাসীকে খাঁটি ভারতীয় করিয়া তুলিতে। তিনি সমাজ-সংস্কারের বিরোধী না হইয়াও কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ, তাঁহার নিকট যাহা সমাজের মূল, তাহাই ছিল 'ধর্ম্ম'। সেইজন্য যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের অতিমাত্রায় উৎসাহে দীর্ঘ দিনের সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন কিন্তু উহার স্থলে কোন কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন না, তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ তিনি সমর্থন করিতেন না। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার মতের সাদৃশ্য ছিল। তিনি প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তাও সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু যে শিক্ষা জাতিকে পরানুবাদী, পরানুচিকীর্ষু, আত্মসম্বিৎশূন্য করে সে শিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন। এই জন্য তিনি প্রথম জীবনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং জাতীয়তার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি মহারাষ্ট্র দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের জন্য এবং সমগ্র ভারতবাসী ও রাজপুরুষগণকে দেশের বৃহত্তম স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য যথাক্রমে মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরেজী ভাষায়

'কেশরী' ও 'The Marhatta' নামে দুইখানি সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্য তিলকের পত্রিকা-পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবাসীকে নিজের অধিকার ও ভারতের শাশ্বত আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা। শিক্ষাব্রতী তিলক ও পত্রিকা-পরিচালক তিলক ছিলেন লোককল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। লোককল্যাণের আদর্শও তিনি ভগবদ্‌গীতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। গীতায় যে 'সর্ব্বভূতহিতের' কথা আছে, লোক-কল্যাণ তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহ্নি রুদ্ররূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন লোকমান্য তিলক তাঁহার পত্রিকায় লর্ড ডাফরিণের ভেদনীতিকে এ জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। তারপর যখন পুণা নগরীতে প্লেগ মহামারীর সময় তিলক স্বয়ং রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সময় দুইজন অত্যাচারী ইংরেজ (যাঁহারা প্লেগের সময় জনসাধারণের ও নারীগণের লাঞ্ছনার জন্য দায়ী ছিলেন) গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। এই ব্যাপারের সঙ্গে লোকমান্য তিলকের সংযোগ আছে এই সন্দেহে বোম্বাই সরকার তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করেন। ইহার পর হইতে তিলক বারংবার রাজপুরুষদের কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও গীতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে যে লোকমান্য তিলক শুধুই অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী, তিনি জানিতেন, অহিংসার আদর্শ খুব বড় বটে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে হিংসাও অহিংসায় পরিণত হইতে পারে। লোকসংস্থিতির জন্য কাহারও পক্ষে ক্রূর কর্ম্ম করার প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু তিনি যদি যোগস্থ হইয়া ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার হিংসাও অহিংসায় পরিণত হয়। এ বিষয়ে লোকমান্য তিলক ছিলেন শিবাজী ও তাঁহার গুরু রামদাসের মতানুবর্ত্তী।

লোকমান্য তিলককে জীবনে বারংবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। আর

কারাগারে বসিয়াই তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'গীতারহস্য' রচনা করিয়াছেন। 'নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার' সহিত যুক্ত হইয়া তিনি নানা ভাবে স্বদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জাতীয় সংহতির জন্য তিনি 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি উৎসবের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে যে মহাভারত বা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে রূপ দিয়াছেন, তিলক কর্ম্মের মধ্যে দিয়া সেই স্বপ্নকেই সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী যে তাঁহাকে বিধাতৃপ্রেরিত নেতার পদে বরণ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

লোকমান্য তিলক বলেন, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোকের চারিটি চরণে চারিটি সূত্রের আকারে সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রথিত হইয়াছে। সেই চারিটি সূত্র এই—

(১) কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে

কেবলমাত্র কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে।

(২) মা ফলেষু কদাচন

ফলে কখনও তোমার অধিকার নাই।

(৩) মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ

কর্ম্মফলের কারণ হইও না অর্থাৎ কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিও না।

(৪) মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি

অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

এখন প্রশ্ন এই—কর্ম্ম কাহাকে বলে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।'

অর্থাৎ—যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়।

লোকমান্য তিলক গীতারহস্যে বলিয়াছেন—

'নিষ্কাম বুদ্ধিতে কিংবা ব্রহ্মার্পণ বিধির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই এক বৃহৎ যজ্ঞ। ইহার জন্য স্বধর্ম্মবিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে হইবে'। (পৃঃ ৩৫৭, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।)

মনে রাখিতে হইবে, লোকমান্য তিলকের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাই ছিল এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান।

গীতায় আরও দুইটি কথা আছে—স্বধর্ম্ম ও লোকসংগ্রহ। মানুষকে স্বধর্ম্মের বা স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্ম করিতে হইবে এবং লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই লোকসংগ্রহ কথাটির তাৎপর্য্য সম্পর্কে লোকমান্য তিলক 'গীতারহস্যে' বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'লোক' শব্দের অর্থ কেবল মনুষ্যজাতি নহে, ইহার দ্বারা সর্ব্বভূতকে এবং মনুষ্যলোক ভিন্ন অন্যান্য লোককেও বুঝাইবে। ইহাদের ধারণ, পোষণ, রক্ষণ ও পালনের নাম লোকসংগ্রহ। তবে মনুষ্যজাতির কল্যাণও ইহার অন্তর্গত। মনুষ্য-জাতির জন্য সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন যাহাতে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। নিষ্কাম ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে যাহাতে লোকশ্রেয় ও সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধিত হয়। ইহাকেই তিলক বলিয়াছেন, প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্ম্ম। আর এই ভাগবত ধর্ম্মের মূল সূত্র—মামনুস্মর যুধ্যচ।

লোকমান্য তিলক এই ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। গীতার কর্ম্ম-যোগকে কি ভাবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, মহামতি তিলক এ যুগে তাহারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সমাপ্ত

